পৃথিবীর অভ্যন্তরে

Banglapdfboi.com

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

রূপান্তর: রকিব হাসান

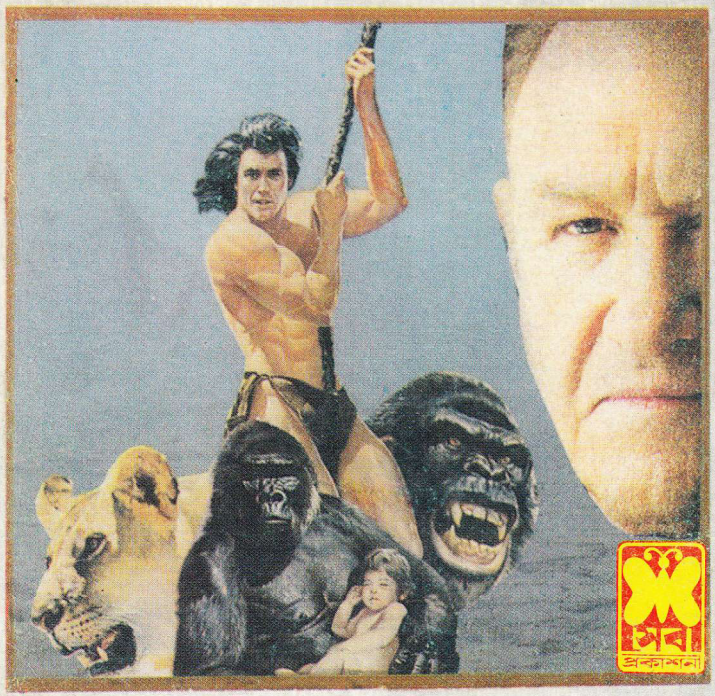

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

পৃথিবীর অভ্যন্তরে

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৮৬

গোড়ার কথা:

পৃথিবীর ভেতরে আরেকটা জগৎ রয়েছে, তার নাম পেলুসিডার। আবিষ্কার করেছিলেন দু'জন ভূ-বিজ্ঞানী, ডেভিড ইনেস আর এবনার পেরি।

অ্যানথ্রেসাইট কয়লার নতুন স্তর খুঁজছিলেন দু'জনে। এ কয়লা জ্বালালে ধোঁয়া হয় না। পেরির আবিষ্কৃত অদ্ভুত একটা যানে চেপে তাঁরা নেমে যাচ্ছিলেন পাতালে। শুরুতেই কি একটা গোলমাল হয়ে গেল যন্ত্রে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন দুই বিজ্ঞানী তারপর স্বাধীন ভাবে নেমে চলল যান। একদিন গেল, দুই দিন…তৃতীয় দিনে অক্সিজেন ফুরিয়ে এল। কেবিনের বদ্ধ বাতাসে আর শ্বাস নিতে পারছেন না তাঁরা। সিলিন্ডারগুলো সব খালি। ইতিমধ্যে পাঁচশো মাইল নেমে এসেছে যান। অজ্ঞান হয়ে গেলেন দু'জনেই। না, মরলেন না তাঁরা। বিশুদ্ধ বাতাস ফুসফুসে ঢুকতেই ফিরে এল জ্ঞান। উঠে বসে দেখলেন, থেমে গেছে যান। ভাঙা জানালা দিয়ে আলো আসছে, বাতাসও আসছে। পরে জেনেছেন, ওপরের মাটির স্তর ভেদ করে পাতালের আরেকটা জগতে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা।

এরপর কেটে গেল অনেক বছর। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেল দুই বিজ্ঞানীর জীবনে। পেরি আর ফিরলেন না বাইরের পৃথিবীতে। তবে ইনেস এসেছিলেন একবার। যানটা ঠিক করে নেয়ার পর তাতে চেপে। যে রাজ্যে গিয়েছেন তাঁরা, সেখানে সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি বিন্দুমাত্র। মানুষ সেই আদিম প্রস্তর যুগেই রয়ে গেছে। তাদের মাঝে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই সভ্য জগতের কিছু জিনিসপত্র আর সহকারী নিতে এসেছিলেন তিনি।

সারাক্ষণই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত পেলুসিডারের আদিম অধিবাসীরা। হয় নিজেদের মাঝে, কিংবা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে। ফলে, যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েও সফল হননি ইনেস আর পেরি, সভ্য করতে পারেননি জগৎটাকে।

আশ্চর্য এক জগৎ ওই পেলুসিডার। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে অনেক অনেক অমিল। প্রথমেই ধরা যাক জলভাগ আর স্থলভাগের কথা। ভূ-পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ পানি, অথচ ভেতরে ঠিক তার উল্টো। ওখানে তিন ভাগই স্থল। ১২,৪১,১০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে আদিম পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল,

তৃণভূমি। আর সমুদ্র ১৩,৭০,০০০ বর্গমাইল। পুরো ব্যাপারটার মাঝেই অদ্ভুত একটা অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। একটা পৃথিবীর ভেতরে এত বড় আরেকটা জগতের জায়গা হলো কি করে? আরেকটা ব্যাপার, যেহেতু একটা খোলসের ভেতরে রয়েছে ওই জগৎটা, ধরেই নেবে যে কেউ, ওখানে সব সময় ঘোর অন্ধকার। কিন্তু মোটেও তা নয়। পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রে স্থির ভেসে আছে পেলুসিডারের সূর্য। জগৎটাও স্থির। ফলে ওটা চির-দুপুরের রাজত্ব। না হয় সকাল, না বিকেল, না রাত্রি। ওখানে চাঁদ নেই, তারা নেই, নেই দিগন্ত—কারণ ভূ-পৃষ্ঠের মত গোলাকার নয় ওটা, সমতল। যে দিকেই তাকানো যায়, চোখে পড়বে সাগর, পাহাড়, জঙ্গল কিংবা তৃণভূমি, একটা পেয়ালার প্রান্তের মত ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। পৃথিবীর মত সময়ের হিসেব ওখানে নেই, দিক নির্ণয়েরও উপায় নেই চাঁদ-তারা না থাকায়। 'মৌমাছির মত ব্যস্ত', 'সময়ের মূল্য', এ সব বেদবাক্যগুলো ওখানে অচল।

এ পর্যন্ত তিনবার পেলুসিডার থেকে খবর এসেছে আমাদের জগতে। দু'বার এখানকার জিনিসপত্র ওখানে নিয়ে যাওয়ার সময়। হ্যাঁ, বলে রাখা ভাল, ওখানে গিয়েছে বারুদ, রাইফেল-বন্দুক গোলাগুলি, বড় শক্তিশালী কামান বসানো ছোট ছোট কয়েকটা যুদ্ধজাহাজ, আর শক্তিশালী একটা বেতার যন্ত্র।

তৃতীয়বার খবর এসেছে পেরির কাছ থেকে, বেতারে। পুরু মাটির স্তর ভেদ করে পৃথিবীর ইথারে যে আসতে পেরেছে শব্দ-তরঙ্গ, এটাই এক আশ্চর্য! তবে এসেছে বিশেষ একটা ওয়েভলেংথে। নতুন এক ধরনের বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছে তখন টারজানা শহরের এক প্রখর বুদ্ধিমান যুবক, জ্যাসন গ্রিডলে। তার শব্দ তরঙ্গের নাম রেখেছে গ্রিডলে-তরঙ্গ। ফলে, একমাত্র তার যন্ত্রেই ধরা পড়েছে পেরির পাঠানো বার্তা।

বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বার্তাটা। অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেছে দ্রুত। তবে তারই মাঝে যেটুকু শুনেছে গ্রিডলে, তার মর্ম কথা: অনেক অনেক দূরের কোরসারদের দেশে এক অন্ধকার কারাগারে চরম দুঃখ কষ্টের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন পেলুসিডারের প্রথম সম্রাট ডেভিড ইনেস।

এক

থমকে দাঁড়াল টারজান। কান পাতল। সেই সঙ্গে গন্ধ শুঁকল বাতাসে।

সাধারণ কোন মানুষের কানে ওই ক্ষীণ শব্দ পৌঁছবে না বাতাসে ওভাবে গন্ধও নিতে পারবে না। তবে টারজান সাধারণ মানুষ নয়। অনেক দূর থেকে আসছে শব্দটা। প্রথমে অস্পষ্ট। তারপর স্পষ্ট হলো ধীরে ধীরে। একদল মানুষ আসছে। হাতি-গণ্ডার, চিতা-সিংহ কিংবা অন্য কোন জানোয়ার হলে বনরাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হত না সেদিকে! কিন্তু এ যে মানুষ! যত গণ্ডগোলের মূল! যেখানেই যাবে, একটা না একটা অঘটন ঘটাবেই। আর মাটিতে থাকল না টারজান। উঠে পড়ল গাছে। পাতার আড়ালে থেকে ডালে ডালে এগিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে।

খানিকটা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল টারজান। আলাদা করে চিনতে পারছে এখন গন্ধগুলো। কালো মানুষের সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ। বিচিত্র আরও নানারকম গন্ধ। সঙ্গে লটবহর রয়েছে ওদের। নিশ্চয় শিকারে এসেছে শ্বেতাঙ্গরা।

নিঃশব্দে দলটার মাথার ওপরে চলে এল টারজান। তারপর মোড় নিয়ে আরেকদিকে খানিকটা এগিয়ে নেমে পড়ল গাছ থেকে। অপেক্ষা করে রইল পথের পাশে।

মোড় ঘুরেই টারজানকে দেখতে পেল দলটা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়াল তারা। উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল কালোদের মাঝে। বিস্মিত চোখে টারজানের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। এই অঞ্চলের লোক নয়, তাই তাকে চিনতে পারছে না।

এগিয়ে গেল টারজান, 'টারজানের রাজ্যে কি চাই?'

দলের একবারে সামনে রয়েছে এক শ্বেতাঙ্গ যুবক। হেসে এগিয়ে এল। 'ও, আপনিই লর্ড গ্রেস্টক?'

'এখানে আমি লর্ডও নই, গ্রেস্টকও নই। বনের রাজা টারজান, বনমানবী কালার ছেলে।'

'ভাগ্য আমাদের ভালই বলতে হবে,' বলল যুবক। 'আপনার খোঁজেই এসেছি আমরা, সেই দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।'

'আপনি কে? আমার কাছে কি দরকার?'

'আমার নাম জ্যাসন গ্রিডলে। জরুরী দরকার আছে। সে এক লম্বা-চওড়া কাহিনী, এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। চলুন না আমার সঙ্গে, আমার ক্যাম্পে। সব বলব। সময় হবে কি?'

'এই বনের রাজ্যে আমাদের সময়ের অভাব হয় না। কোথায় আপনার ক্যাম্প?'

'ফেলিনি এখনও। কোথায় ফেললে ভাল হবে বলতে পারেন?'

একটু ভেবে বলল টারজান, 'হ্যাঁ, আধ মাইল দূরে পাহাড়ের ধারে ভাল একটা জায়গা আছে। ঝর্না আছে, শিকারও আছে।'

'গুড,' বলল জ্যাসন। 'তাহলে চলুন সেখানেই যাওয়া যাক।'

এগোল ওরা। শিগগিরই বিশ্রাম পাওয়া যাবে জেনে কুলিরাও খুব খুশি। দরাজ গলায় গান ধরেছে।

*

সেই দিনই সন্ধ্যায়। আগুনের পাশে বসে কফি খাচ্ছে টারজান আর জ্যাসন।

এক সময় টারজান বলল, 'এবার বলুন, আমাকে কেন খুঁজছিলেন?'

দ্বিধা করছে জ্যাসন। কাপের কফিটুকু শেষ করল। গলা খাঁকারি দিল অযথাই। অবশেষে বলল, 'কোন্‌খান থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। সব কথা শুনলে হয়তো আমাকে পাগলই ঠাউরে বসবেন।' আবার দ্বিধা করল সে। 'নাঁহ্, বলেই ফেলি। তবে জেনে রাখুন, একটা কথাও মিথ্যে নয়। যা বলব, সব সত্যি। একটা অভিযানে বেরোনোর ইচ্ছে আমার। প্রচুর টাকা দরকার। না-না, আপনার কাছে টাকা চাইতে আসিনি। আমার অনেক আছে। ইতিমধ্যে খরচও করে ফেলেছি অনেক। সব খরচ করে ফেললেও ভয় নেই। আরও টাকা দেয়ার লোক আছে।'

হাসল টারজান। 'এত টাকার ব্যাপার, অথচ খরচ করতে দ্বিধা নেই। নিশ্চয় খুব লাভজনক হবে ব্যাপারটা?'

'মোটেও না,' জবাব দিল জ্যাসন। 'একটা পয়সাও উঠে আসবে না। শুধুই খরচ।'

ভুরু কোঁচকাল টারজান। 'সত্যি? টাকা উঠে আসবে না, অথচ···আপনি সত্যি আমেরিকান তো?'

হাসল জ্যাসন। 'বুঝতে পারছি, একটা ভুল ধারণা আছে আপনার। সব আমেরিকানই টাকার পাগল নয়।'

'তাহলে?' এবার সত্যিই অবাক হলো টারজান। 'পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

'পৃথিবী একটা ফাঁপা গোলক, এর ভেতরে আরেকটা জগৎ রয়েছে। কথাটা শুনেছেন কখনও?'

'শুনেছি।'

'আপনার কি ধারণা?'

'দেখুন, আমি বিজ্ঞানী নই। লেখাপড়াও খুব একটা জানি না। জঙ্গল সম্পর্কে যা খুশি জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারব। কিন্তু পৃথিবীর ভেতরে কিংবা বাইরে আর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, জানি না। জানতে চাইও না।'

'কোন রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কথাও কি শুনতে চান না? আফ্রিকার বাইরের কোথাও?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। শুনতে ভালই লাগবে।'

'বেশ,' বলল জ্যাসন। 'বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি কথাটা। কিন্তু পরে এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা তাঁদের বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে ছেড়েছে। এই কিছু দিন আগে পাতালের সেই জগৎ থেকে খবর এসেছে। মানুষের পাঠানো।'

'আশ্চর্য তো!' আগ্রহী হয়ে উঠছে টারজান।

'হ্যাঁ,' অবাক আমিও হয়েছিলাম। বার্তাটা ধরেছিলাম আমিই।'

পাতালের সেই জগতের নাম পেলুসিডার। বার্তা পাঠিয়েছেন একজন ভূ-বিজ্ঞানী, এবনার পেরি। খবরটা যখন আসে, আমার পাশে আরও একজন ছিল। সে-ও আমারই মত শুনেছে। তাকে আপনি চেনেন। তার কাছ থেকে একটা চিঠিও এনেছি যদি আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করেন, সেজন্যে।'

ছোট একটা পোর্টফোলিও থেকে একটা চিঠি বের করে টারজানের হাতে তুলে দিল জ্যাসন।

'আপনি বলে যান,' চিঠিটা খুলল না টারজান। 'বিশ্বাস করছি আমি।'

'মোট কথা,' বলল জ্যাসন, 'পেলুসিডারের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে আমার। ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে যাব ওখানে। যে করেই হোক, খুঁজে বের করব কোরসারদের কয়েদখানা।'

'কিন্তু সে কি করে সম্ভব?' জানতে চাইল টারজান। ঢুকবেন কি করে পাতালে?'

'এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি,' বলল জ্যাসন। 'বার্তাটা পাওয়ার পর অনেক খোঁজখবর করেছি। কারও কারও বিশ্বাস পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু দিয়ে পাতালে ঢোকার পথ রয়েছে। এ বিশ্বাস আজকের নয়। আঠারোশো, কিংবা তারও আগে থেকে এটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন বিজ্ঞানীরা। আঠারোশো ত্রিশ সালের একটা বইতে এর ওপরে লেখা আছে, আমি পড়েছি।'

'হুঁ,' আস্তে মাথা নাড়ল শুধু টারজান।

'তাহলে, ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, পাতালে একটা জগৎ আছে, এবং সেখানে ঢোকার পথও আছে। এখন প্রশ্ন, ঢুকব কি করে? মানে কোন্ ধরনের যানে চেপে?'

অপেক্ষা করছে টারজান।

'নিশ্চয় জানেন, উত্তর মেরুতে অভিযান চালিয়েছিলেন আমুন্ডসেন আর এলসওয়ার্থ,' বলল জ্যাসন। 'তাঁরা সুড়ঙ্গ বা ওই ধরনের কোন পথের সন্ধান পাননি। পরে প্লেন নিয়ে আরও অভিযান-চালানো হয়েছে, কেউই সুড়ঙ্গ পায়নি। আমার ধারণা, সুড়ঙ্গ-মুখটা এত বড় ওটাকে সুড়ঙ্গ বলেই মনে হয় না। বরফের দেশের অসংখ্য উঁচুনিচুর মাঝে ওটা মিশে গেছে। আলাদা করে চেনা খুব কঠিন। আমার এ বিশ্বাসের কারণ রয়েছে। মেরুজ্যোতির কথা সবাই জানি আমরা। ওটা, আমার মতে পেলুসিডারের সূর্য। পৃথিবীর কেন্দ্রে ভয়ানক গরম, এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। আগুনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল কোন পদার্থ জ্বলছে নিশ্চয় ওখানে এখনও। ওটাই আলো দিচ্ছে

পেলুসিডারকে…'

এ সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঠিক বুঝতেও পারছে না, ভালও লাগছে না টারজানের। অধৈর্য হয়ে বাধা দিল জ্যাসনের কথায়, 'মোদ্দা কথা, আপনি প্লেন নিয়ে যেতে চান, এই তো?'

হাসল জ্যাসন। 'হ্যাঁ, আধুনিক জেপেলিন ধরনের কোন প্লেনে করে। কি ভাবে বানাতে হবে ওই যান, সে পরিকল্পনা করে রেখেছি আমি। পেট্রোল কিংবা ওই ধরনের কোন জ্বালানিতে চলবে না, ব্যবহার করতে হবে হিলিয়াম গ্যাস। কিন্তু তবু কিছু কিছু অসুবিধে থেকেই যাবে। তেলের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ হিলিয়াম নেয়া যাবে বিমানে। পেলুসিডারে পৌঁছে যাবে ঠিকই, কিন্তু ফেরত আসার মত গ্যাস আর অবশিষ্ট থাকবে কিনা তখন, বলা মুশকিল। তবে যে কোন অভিযানে ঝুঁকি কিছুটা নিতেই হয়। গ্যাসের খরচ কমানো যেত, যদি হালকা অথচ শক্ত কোন ধাতু পেতাম। সেক্ষেত্রে গতিবেগ অনেক বেড়ে যেত বিমানের, জ্বালানিরও খরচ হত কম। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয় সম্ভব,' এতক্ষণে সত্যি সত্যি আগ্রহ প্রকাশ করল টারজান।

'সম্ভব! কি করে? সেরকম ধাতু আপনি পাচ্ছেন কোথায়?'

'আমার এক বিজ্ঞানী বন্ধুর কথা মনে পড়ছে,' বলল টারজান। 'তার নাম এরিক ফন হারবেন। ওয়াইরামওয়াজি পর্বতমালায় দেখা হয়েছিল। একটা বিপদে সাহায্য করেছিলাম তাকে। এরপর কিছুদিন সেখানে ছিলামও তার সঙ্গে। হারবেন বলেছে, ওখানকার পার্বত্য উপত্যকায় এক হ্রদের ধারে এক উপজাতি বাস করে, যারা নৌকা বানায় বিশেষ ধরনের ধাতু দিয়ে। কর্কের মত হালকা, অথচ ইস্পাতের চেয়ে শক্ত। সেই ধাতুর কিছুটা নমুনাও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল হারবেন। তার বাবা একজন মিশনারি। বাবার সঙ্গেই থাকে এখন সে। ছোটখাট একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে ওই ধাতু নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

'কোথায় আছেন এখন হারবেন?' আগ্রহে ফেটে পড়ছে জ্যাসন।

'উরাম্বি অঞ্চলে,' জানাল টারজান। 'এখান থেকে হাঁটাপথে দিন চারেকের পথ, পশ্চিমে।'

'চলুন, আজই রওনা হয়ে পড়ি!' তর সইছে না যেন আর জ্যাসনের।

'রাতের বেলা আর রওনা হয়ে লাভ নেই,' হেসে বলল টারজান। 'সকালেই যাব।'

গভীর রাত অবধি এ সব নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করল দু'জনে।

পরদিন ভোরেই রওনা হলো ওরা। পথে কোন রকম বিপদ ঘটল না। নিরাপদেই চারদিনের দিন বিকেলে এসে পৌঁছল উরাম্বি অঞ্চলে, ড· ফন হারবেনের মিশনে। সাদরে তাদেরকে গ্রহণ করলেন ডাক্তার, তাঁর ছেলে এরিক এবং পুত্রবধূ সুন্দরী ফেবোনিয়া।

জানা গেল, গবেষণা চালিয়ে ওই ধাতুকে অনেক উন্নত করেছে এরিক।

ধাতুর নাম রেখেছে হারবেনাইট। অনুসন্ধান করে কাছাকাছিই এর একটা খনিও আবিষ্কার করেছে সে।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কাজ। এরিক ফন হারবেন আর শ্রমিকদের নিয়ে খনিতে চলে গেল টারজান। জ্যাককে নিয়ে জেন গেছে ইংল্যান্ডে। কাজেই এই অভিযানে অংশ নিতে কোন অসুবিধা নেই টারজানের।

ধাতু তুলে সাগর উপকূলে চালান দেয়ার ব্যবস্থা হতে লাগল। জ্যাসন গ্রিডলে চলে গেল জার্মানীর ফ্রিডরিখ শ্যাফেনে। পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা বিমান তৈরির জন্যে সে আলাপ-আলোচনা করবে বিমান-কারখানার এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে।

খুব গোপনে চলল বিমান তৈরির কাজ। খবরের কাগজঅলারা শুনলে ফলাও করে ছাপবে সে-খবর। মহা শোরগোল বাধিয়ে ছাড়বে। বিঘ্ন ঘটাবে অভিযাত্রীদের কাজে, তাই এই গোপনীয়তা।

একটানা ছ'মাস কঠোর পরিশ্রমের পর তৈরি হলো বিমান।

দেখতে বিশাল এক চুরুটের মত। ৯৯৭ ফুট লম্বা, ব্যাস ১৫০ ফুট। খোলের ভেতরে রয়েছে ছয়টা বড় বড় বায়ুশূন্য চেম্বার। একটা ছোট স্কাউট প্লেন নেয়ার জায়গাও করা হয়েছে। এঞ্জিন ঘরটা তৈরি হয়েছে এমনভাবে, যাতে আগুন লাগতে না পারে। মোটর, জেনারেটর আর প্রপেলারের কিছু অংশ ছাড়া বাকি সব কিছু, এমনকি আসবাবপত্রও হারবেনাইটে তৈরি। মোট আটটা মোটর ঘোরাবে আটটা প্রপেলারকে। ৫৬০০ অশ্বশক্তির এঞ্জিন, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১০৫ মাইল।

বিমানটার নাম রাখা হলো 'ও-২২০'।

দুই

জুনের এক সুন্দর ভোর। আকাশে ওড়ার জন্যে প্রস্তুত ও-২২০। একে একে বিমানে উঠে পড়ল যাত্রীরা। আকাশে ওড়ার প্রথম মহড়া হবে আজ বিমানটার।

অনেক ভেবেচিন্তে বেছে বেছে নেয়া হয়েছে যাত্রী। এরা সবাই মূল যাত্রায়ও অংশ নেবে। ক্যাপ্টেনের নাম জুপনার। তার তদারকিতেই নির্মিত হয়েছে বিমানটি। ডিজাইনের ব্যাপারেও সাহায্য করেছে সে। তার সহকারী নিযুক্ত হয়েছে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর দু'জন প্রাক্তন অফিসার: ফন হোর্স্ট, ও ডর্ফ। নেভিগেটর হিসেবে নেয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট হাইন্সকে। এ ছাড়া রয়েছে বারোজন এঞ্জিনীয়ার, আটজন মেকানিক, একজন নিগ্রো বাবুর্চি আর ফাইফরমাশ খাটার জন্যে দু'জন ফিলিপিনো ছেলে।

দলপতি নিযুক্ত করা হয়েছে টারজানকে। তার সহকারী জ্যাসন গ্রিডলে। দশজন ওয়াজিরি যোদ্ধার একটা দলকে সঙ্গে নিয়েছে টারজান। ওদের সর্দার মুভিরো।

স্টার্ট নিল এঞ্জিন। আকাশে উড়াল দিল ও-২২০। স্বচ্ছন্দে ভেসে চলল শহরের ওপর দিয়ে।

খুশি আর চেপে রাখতে পারল না জুপনার। বলে উঠল, 'এত সুন্দর বিমান আর দেখিনি! যেন জ্যান্ত! আঙুল ছোঁয়ালেই সাড়া দেয়।'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল হাইন্স। 'যাত্রী দ্বিগুণ, নইলে আরও সহজে চলত। বলেই আড়চোখে তাকাল একবার টারজানের দিকে।

'আবার সেই একই কথা তুলছ, লেফটেন্যান্ট,' হেসে বলল টারজান। 'কতবার তো বললাম, নতুন এক জগতে যাচ্ছি আমরা। কতদিন লাগবে, কে জানে। তা ছাড়া ওখানে বিপদ কতখানি, তারও সঠিক কোন ধারণা নেই। মাত্র দশজন বাড়তি লোক কত কাজে লাগে, দেখো পরে। আরও একটা ব্যাপার, ফেরার পথে হয়তো আরও সহজে চালাতে পারবে বিমান। সবাই যে ফিরে আসতে পারব, এটা বিশ্বাস হয় না আমার।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক,' নিচের দিকে চেয়ে বলল হাইন্স। 'কিন্তু এখন সে-কথা মনে হচ্ছে না একবারও। সব কিছুই শান্ত, স্বাভাবিক।'

'এ-অবস্থা থাকলে ভালই,' একটু যেন গম্ভীর মনে হলো টারজানকে। 'যারা যাচ্ছি, সবাই আবার ফিরে আসতে পারব কিনা কে জানে! সে জন্যেই আগে থেকে সাবধান রয়েছি আমি। আমি আর জ্যাসন প্লেন চালাতে শিখেছি। যদি বৈমানিকদের কিছু ঘটে যায়...' কথাটা শেষ করল না সে।

হেসে উঠল জুপনার। 'তা শিখেছ।' অনেক দিনের পরিচয়ে আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে সম্বোধন। 'কিন্তু চালানোর আর সুযোগ পাবে না। বার্লিনের সেরা হোটেলে সেরা ডিনার খাওয়ানোর বাজি ধরছি, পাতাল থেকে ফেরার সময় আমিই এটার ক্যাপ্টেন থাকব।'

'তোমাদেরকে আসলে বোঝাতে পারছি না,' মাথা নাড়ল টারজান। 'বিপদে আমার জন্ম, আমি বিপদের মাঝে বড় হয়েছি, তাই বিপদের গন্ধ পাই অনেক দূর থেকে, অনেক আগে থেকে। দশজন লোক বেশি নিয়েছি, শুধু তাই নয়, ওদেরকে এঞ্জিনীয়ার আর মেকানিকদের সহকারী বানিয়ে দেয়ারও অনুরোধ জানাচ্ছি। বুদ্ধিমান আর চটপটে দেখেই নিয়েছি। যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারবে, তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবে যে কোন কাজ। দেখো, বিপদের সময় খুব কাজে লাগবে।'

'বেশ বলল,' জুপনার। 'তুমি দলপতি। যা বলবে সেভাবেই কাজ হবে।'

প্রকাণ্ড বিমানটা স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে উত্তরে। পেছনে পড়ে রইল রাভেন্সবুর্গ। আধ ঘণ্টা পর ধূসর একটা ফিতের মত সামনে দেখা গেল দানিয়ুব। এক সময় নদীটাকেও পেছনে ফেলে এল বিমান। ধীরে ধীরে ওপরে আরও ওপরে উঠছে।

উৎসাহ বাড়ছে জুপনারের। 'সত্যি বলছি, এত নিখুঁত হবে প্লেনটা,

ভাবিনি। উড়োজাহাজের জগতে একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে। হামবুর্গ এসে গেছে। প্রায় চারশো মাইল পাড়ি দিয়েছে এটা ইতিমধ্যেই। সামান্য গোলমাল করেনি। চমৎকার!'

জানালা দিয়ে নিচে চেয়ে আছে টারজান। হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে কোথায় চলেছ? হামবুর্গ থেকে আবার ফ্রিডরিখ শ্যাফেনে ফিরে যাওয়ার কথা না? ঘুরছ না কেন?'

টারজানের আশেপাশে বসা সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চোখে জিজ্ঞাসা সবারই।

'তাই তো?' বলে উঠল জ্যাসন। 'ঘুরছ না কেন? কোথায় চলেছ?'

'যারা যারা পাতালে যাব, সবাই-ই তো এসেছি আজ,' বলল জুপনার। 'জিনিসপত্রেরও অভাব নেই। তাহলে খামোকা আর ফিরে যাওয়া কেন?'

'ঠিক,' জোরে মাথা ঝাঁকাল হাইন্স। 'অযথা আরও চারশো মাইল ফিরে যাওয়া। এই আটশো মাইলই অহেতুক নষ্ট হবে। তার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই তো ভাল।'

'মন্দ বলোনি,' আস্তে মাথা দোলাল টারজান। 'মত নিয়ে দেখা যাক অন্য সবার। সবাই রাজি থাকলে ফিরে যেতে চাই না আর। সোজা উত্তরে এগিয়ে যাব।'

কেউ অরাজি হলো না। সুতরাং মহড়া পরিবর্তিত হলো মূল অভিযানে। গতিপথ বদল করল ও-২২০।

একনাগাড়ে উড়ে চলেছে বিমান। হামবুর্গ ছাড়িয়ে এসেছে অনেক আগে। উত্তর সাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি পেরোল, এগোল উত্তরে, আরও উত্তরে। গন্তব্য, স্পিটসবার্জেনের পশ্চিমে উত্তর মেরুর নিঃসীম নির্জন বরফের রাজ্য।

ঘণ্টায় ৭৫ মাইল গতিতে এগিয়ে দ্বিতীয় দিন মাঝরাত নাগাদ উত্তর মেরুতে পৌঁছে গেল বিমান। হাইন্স ঘোষণা করল, উত্তর মেরুর চাঁদির ওপরে চলে এসেছে। উত্তেজনা দেখা দিল যাত্রীদের মাঝে। জমাট বরফের কয়েকশো ফুট ওপরে ধীরে ধীরে চক্কর দিতে শুরু করল বিমান। তারপর এগোল ১৭০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর দক্ষিণে।

এখন থেকে সাবধানে থাকতে হবে, সতর্ক হয়ে চালাতে হবে বিমান। এটা উত্তর মেরু। নানা রকম বিপদ সারাক্ষণই ঘাপটি মেরে আছে এখানে।

যন্ত্রপাতির দিকে কড়া নজর জুপনার আর হাইন্সের। তাদের পাশে বসে আছে জ্যাসন। কখনও তাকাচ্ছে মিটার বোর্ডের দিকে, কখনও জানালা দিয়ে নিচের বরফ দেখছে। এবড়ো-খেবড়ো বরফের পাহাড় কোথাও কোথাও কয়েকশো ফুট উঠে গেছে। ওগুলোর কোনটার সঙ্গে বিমানের নাক ঠোকর খেলেই সর্বনাশ।

জ্যাসনের বিশ্বাস, পাতালে যাওয়ার সুড়ঙ্গ-মুখটা ৮৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ আর ১৭০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। তার চোখ এখন কম্পাসের ওপর স্থির। অন্য কোনদিকে নড়ছে না।

আরও পাঁচ ঘণ্টা একটানা দক্ষিণে উড়ে এল বিমান। কেন যেন এক পাশে

কাত হয়ে আছে, সোজা করা যাচ্ছে না। কম্পাসের কাঁটাও স্থির থাকতে চাইছে না এক জায়গায়।

'বিমান সামলাও ক্যাপ্টেন,' হুঁশিয়ার করে দিল জ্যাসন। 'কম্পাসের অবস্থা দেখেছ? আমার মনে হয়, সুড়ঙ্গ-মুখটাতে এসে গেছি।...আরে আরে, ঘুরছে! কাঁটাটা ঘুরছে কি রকম দেখছ! মেরুর আকর্ষণ আর নেই মনে হচ্ছে!'

'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনাল জুপনারের কণ্ঠ। 'নিচের তলও হঠাৎ যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। লাফ দিয়ে মহাশূন্যে উঠে পড়েছে যেন বিমানটা! আশ্চর্য!'

'নামো, নামো, নিচে নামো!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাসন। 'নিশ্চয় ওই সুড়ঙ্গের ওপরে চলে এসেছি আমরা। অনেক নিচে রয়েছে পেলুসিডারের মাটি!'

'কি জানি!' সন্দেহ যাচ্ছে না জুপনারের।

নীরব রইল সবাই। উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত।

'এত আলো! মেরুতে!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জ্যাসন। 'পেলুসিডারের সূর্য না তো?'

জবাব দিল না জুপনার। নিয়ন্ত্রক দণ্ডের ওপর হাত স্থির।

'আরে! নিচে কি! মাটি, নাকি পানি!' হাইন্স চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল হাইন্স। নীরবে শুনল। তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন, ওয়াচ-কেবিন থেকে ফন হোর্স্ট।' সে-ও দেখতে পেয়েছে। ওখান থেকে আরও স্পষ্ট। 'নিচে এক বিশাল প্রান্তর।'

'প্রান্তর!' জুপনারের কণ্ঠে বিস্ময়! 'পথ ভুল করলাম না তো? ভুলে সাইবেরিয়ায় চলে এসেছি হয়তো!'

'তা কি করে হয়,' জ্যাসন বলল। 'সাইবেরিয়া ৮৫ ডিগ্রি অক্ষরেখার অন্তত হাজার মাইল দক্ষিণে, আমরা রয়েছি তিনশো মাইলের মধ্যে।'

'তাহলে হয় নতুন একটা বরফে ঢাকা অঞ্চল আবিষ্কার করেছি!' বলল হাইন্স, 'নয় তো ঢুকে পড়েছি পেলুসিডারের আকাশে।'

'পরের সম্ভাবনাটাই ঠিক,' বলে উঠল জুপনার।

ঘুরে তাকাল হাইন্স।

থার্মোমিটারের দিকে চেয়ে আছে জুপনার। হাইন্সকে বলল, 'মিটারটা দেখো। তাপমাত্রা দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'আরে! শূন্যের ওপরে। বিশ ডিগ্রি! হঠাৎ এভাবে উঠে গেল তাপমাত্রা!' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন হাইন্স।

'মাটি দেখা যাচ্ছে নিচে,' এতক্ষণে কথা বলল টারজান। 'নির্জন।...জায়গায় জায়গায় বরফ গলে যাওয়ার চিহ্ন।'

'মিলে যাচ্ছে,' বলল জ্যাসন। 'ইনেসের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এটা সম্ভবত উত্তর কোরসার।'

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। যে যেখান দিয়ে পারল, জানালার

কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল। চেয়ে আছে নিচের দিকে। দেখছে নতুন দেশটাকে।

নেমেই চলেছে বিমান। আলো বাড়ছে। হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় সরে গেল মাথার ওপরের মেঘলা আকাশ। উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে এল ও-২২০। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে সূর্য। কেমন লালচে ঘোলাটে আলো। বোঝা গেল, ওটা পেলুসিডারের সূর্য। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন নিচের সব কিছু।

নামা বন্ধ করে দক্ষিণে মোড় নিল বিমানের নাক। এগোল আবার।

নিচে দ্রুত বদলে যাচ্ছে ধরণীর চেহারা। পেছনে পড়ল অনুর্বর প্রান্তর। জঙ্গলে ঢাকা একটা পাহাড় পেরিয়ে এল বিমান। সামনে বিস্তীর্ণ বনভূমি। দিগন্তে নেমে আসেনি আকাশ, বন আর মাটিই বরং উঠে গিয়ে মিশে গেছে সমতল আকাশের সঙ্গে। ধূসর দিগন্তরেখা। আশ্চর্য এক দৃশ্য! এতদিন এরই স্বপ্ন দেখেছে জ্যাসন গ্রিডলে। এখন তাই তাজ্জব হয়ে দেখছে সেই আরেক পৃথিবীকে।

বনের পর ঢেউ খেলানো লম্বা ঘাসের মাঠ। তার মাঝে কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে আছে একআধটা গাছ। প্রান্তরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরু নদী, বড় আরেকটা নদীতে গিয়ে মিশেছে। দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানারকম জন্তু-জানোয়ার, কিন্তু মানুষের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

'আমার কাছে স্বর্গ মনে হচ্ছে জায়গাটাকে,' বলল টারজান। 'জুপনার, এখানে নামা যাক।'

বাতাস টেনে নেয়া হলো বড় ট্যাংকগুলোতে। ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল বিমান। মাটি থেকে পেটটা রইল ছয় ফুট উঁচুতে। মই নামিয়ে দেয়া হলো। একজন অফিসার আর দু'জন সহকারীকে বিমানে পাহারায় রেখে নেমে পড়ল সবাই।

হাঁটু সমান উঁচু সবুজ ঘাস। দোল খাচ্ছে বাতাসে। যেন বিশাল এক শূন্য ফসলের খেত।

'ভেবেছিলাম তাজা মাংস পাব,' হতাশ কণ্ঠে বলল টারজান। তাকাচ্ছে ছুটন্ত প্রাণীগুলোর দিকে। 'কিন্তু হলো না। সব পালাচ্ছে বিমানের শব্দে।'

'ভাববেন না,' বলল ডর্ফ। 'যে পরিমাণ আছে এ দেশে···শিগগিরই ফিরে আসবে আবার। ঘাস খেয়ে বাঁচতে হবে ওদের। এলে তখন ধরে ফেলা যাবে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে,' টারজান বলল, 'তবে মাংসের চেয়েও এখন আমাদের বেশি দরকার বিশ্রাম। বড় বেশি উত্তেজনা গেছে গত তিন দিন। ঘুমাতে পারিনি কেউ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কিছু হবে না। চলো সবাই, আবার উঠে পড়ি। আগে ঘুম, তারপর বেরোব কোরসারদের শহর খুঁজতে।'

সবাই রাজি।

একে একে আবার উঠে পড়ল ওরা বিমানে।

জুপনারকে বলল জ্যাসন, 'ক্যাপ্টেন একটা হুকুম জারি করে দাও। তোমার অনুমতি ছাড়া বিমান ছেড়ে কেউ কোথাও যেতে পারবে না। দূরে

কোথাও যেতে হলে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দল বেঁধে যাবে। সঙ্গে থাকবে অন্তত একজন অফিসার। জন্তু-জানোয়ারের চেহারা যা দেখলাম, আর বনজঙ্গল যা দেখতে পাচ্ছি, এখানকার মানুষেরা সব মানুষখেকো হলেও অবাক হব না।'

হেসে বলল টারজান, 'আমিও এই হুকুমের আওতায় পড়ব?'

'তোমার কথা আলাদা,' হাসল জুপনারও। 'আমার বিশ্বাস, যে কোন জঙ্গলে বাঁচতে পারবে তুমি। জন্তু-জানোয়ার আর জংলীরা তোমার কিছু করবে বলে মনে হয় না। ওদেরই একজন তো।'

'হলামই বা, ক্ষতি কি?' বলল টারজান, 'জন্তু-জানোয়ারেরা মানুষের চেয়ে ভাল। যাকগে, কাজের কথায় এসো।'

'দলপতি হিসেবে হুকুমটা তুমিই জারি করো,' বলল জুপনার। 'নিজেকে হুকুমের আওতা থেকে বাদ রাখতে চাও রাখো, কেউ কিছু মনে করবে না। আমার মনে হয় হুকুম জারি না করলেও চলবে, একা বেরোতে সাহস করবে না কেউ। যা একখান দেশ!'

তবু জারি করা হলো হুকুম। প্রতি চার ঘণ্টা অন্তত পাহারা বদলের ব্যবস্থা হলো।

প্রহরী বাদে অন্যদের মাঝে সবার আগে ঘুম ভাঙল টারজানের। উঠে বিমান থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। তখন পাহারায় রয়েছে লেফটেন্যান্ট ডর্ফ। সে দেখল, ঘাসপ্রান্তর পেরিয়ে বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনের রাজার কালো মাথা।

অপরিচিত জঙ্গল, গাছপালা বেশির ভাগই অচেনা। আফ্রিকার জঙ্গলে দেখেনি কখনও টারজান। কিন্তু তবু বন। খুব ভাল লাগছে তার। মুক্তির স্বাদ পেয়েছে অনেক দিন পর। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে পেলুসিডারের নির্মল, বিশুদ্ধ বাতাস। গাছে উঠে পড়ল। ঝুলে ঝুলে বেড়াতে লাগল এ-গাছ থেকে সে-গাছে। ভয় পেয়ে সরে পড়ছে নাম না জানা হাজারও পাখি আর শাখাচার জানোয়ার।

মুক্তির আনন্দে পাগল হয়ে উঠেছে যেন টারজান। সময়ের হিসেব নেই, হিসেব করা সম্ভবও নয়। একনাগাড়ে আলো দিয়ে যাচ্ছে পেলুসিডারের অনন্ত সূর্য। একটুও নড়চড় নেই, স্থির হয়ে রয়েছে এক জায়গায়। আলো কমছেও না বাড়ছেও না। সেদিকে খেয়াল নেই টারজানের। ভুলেই গেছে, আফ্রিকার জঙ্গল নয় অন্য এক অচেনা অরণ্যে রয়েছে। চলার পথে চিহ্ন রেখে যাওয়ার কথাও ভুলে গেছে তাই।

সময় গেল। প্রাথমিক উৎসাহে ভাটা পড়ল টারজানের। খিদে পেয়েছে। গাছ থেকে নেমে এল সে, বুনো জানোয়ার চলাচলের পথের ওপর। ভীষণ বড় বড় গাছ এখানটায়, মোটা মোটা লতা জড়িয়ে রেখেছে। বড় বড় পাতা—গাছেরও, লতারও। বড় বড় ফুল, উজ্জ্বল রঙ, বিচিত্র। সবই অচেনা। সব কিছুই কেমন আদিম মনে হচ্ছে তার কাছে।

কয়েক পা এগোল টারজান। সামান্য ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা ফুল ছিঁড়তে যাবে, হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টান লাগল পায়ে। চোখের পলকে শূন্যে

উঠে পড়ল তার শরীরটা। ঝুলছে। মাথা নিচের দিকে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। টারজান বুঝতে পারল, জংলীদের জানোয়ার-ধরা ফাঁদে ধরা পড়েছে। দড়ির বদলে ব্যবহার করা হয়েছে চামড়ার ফালি, দুই পায়েই আটকে গেছে ফাঁস। বেকায়দা অবস্থা। খোলার কোন উপায়ই নেই। মাটি থেকে ছয় ফুট ওপরে ঝুলছে তার মাথা।

বিশেষ চিন্তিত হলো না টারজান। ফাঁদ যখন রয়েছে, তখন মানুষও রয়েছে কাছেপিঠেই। শিগগিরই আসবে ওরা। ছাড়িয়ে নেবে ওকে।

একটা অদ্ভুত গন্ধ এসে লাগল টারজানের নাকে। নিশ্চয় কোন ধরনের জানোয়ার, কিন্তু অপরিচিত। সিংহ নয়, চিতা নয়, হায়েনা নয়। শুকনো পাতায় পা ফেলার শব্দও কানে আসছে। হুউউশ করে ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে এল জীবটা। বিরাট এক ষাঁড়। লম্বা রোমে ঢাকা শরীর। মাথায় বিশাল শিং। বিস্মিত হলো টারজান। প্রাগৈতিহাসিক টাগ নয় তো!

চুপচাপ ঝুলছে টারজান। তাকে দেখে ফেলল ষাঁড়। বিচিত্র শব্দ করে উঠল। মুহূর্তে পাল্টে গেল ভঙ্গি। চোখা খুরের ঘায়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। মাথা নিচু করে ভয়ানক ভঙ্গিতে দোলাতে লাগল শিং। আক্রমণের পূর্বাভাস। যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসবে। শংকিত হয়ে উঠল টারজান। ওই সাংঘাতিক শিংয়ের খোঁচার দরকার নেই, জন্তুটার শুধু মাথার বাড়ি লাগলেই তার খুলিটা ডিমের খোসার মত গুঁড়িয়ে যাবে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ষাঁড়টা। নাকের ফুটো বিস্ফারিত, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। বাতাসে গন্ধ নিচ্ছে কিসের যেন! নাকি আক্রমণের আগে ওরকম করে এসব জন্তু?

টারজানের নাকেও ঢুকল তীব্র পচা একটা গন্ধ। কাছেপিঠেই এসে দাঁড়িয়েছে কোন মাংসাশী জানোয়ার।

আস্তে করে একপাশে মাথা ঘোরাল ষাঁড়টা। ঘন একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এই সময় মাটি কেঁপে উঠল ভয়ঙ্কর শব্দে। সমান তালে চেঁচিয়ে উঠে জবাব দিল ষাঁড়টা। পালানোর কোন লক্ষণ নেই। বরং রুখে দাঁড়াচ্ছে।

পর মুহূর্তেই এমন একটা দৃশ্য দেখল টারজান, যা এর আগে কোন সভ্য মানুষ দেখেছে কিনা সন্দেহ। বিশাল একটা জানোয়ার বেরিয়ে এল ঝোপঝাড় ভেঙে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ষাঁড়ের পিঠে। থাবার লম্বা লম্বা বাঁকানো নখ বসিয়ে দিল শিকারের কাঁধে। খোলা তলোয়ারের মত মারাত্মক দুই দাঁত দিয়ে কোপাতে শুরু করল গলার এক পাশে।

তাজ্জব হয়ে চেয়ে আছে টারজান। দুটোই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার, আর কোন সন্দেহ নেই তার। মাংসাশী প্রাণীটা দাঁতাল বাঘ, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী থেকে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের।

আক্রমণ প্রতিহত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ষাঁড়টা। ঝাড়া মেরে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইছে বাঘটাকে। পেরে উঠছে না কিছুতেই। গলা চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণধার দাঁতের আঘাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে

আসছে ক্ষতস্থান থেকে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আর বেশিক্ষণ পায়ের ওপর খাড়া থাকতে পারবে না।

শেষ চেষ্টা করল ষাঁড়টা। তীব্র গতিতে ছুটে গেল একটা গাছের দিকে। ঘষা লাগিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইল বাঘটাকে।

ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারল বাঘ। প্রচণ্ড থাবা মারল। হাড় ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ষাঁড়ের খুলি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

ধীরে সুস্থে শিকারের ওপর থেকে নেমে এল দাঁতাল বাঘ। জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত জিরিয়ে নিয়ে এগোল আবার। চিরে ফেলল ষাঁড়ের এক পাশ। মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করল।

খেতে খেতেই টারজানের ওপর নজর পড়ল বাঘের। থমকে গেল। কুটিল চোখে চেয়ে রইল দীর্ঘ এক মুহূর্ত। গম্ভীর একটা শব্দ বেরোল গলার ভেতর থেকে। প্রকাণ্ড হাঁ করে মুখ ভেংচাল একবার। তারপর পায়ে পায়ে এগোল ঝুলন্ত মানুষটার দিকে।

তিন

অনেক ঘটন-অঘটন ঘটিয়ে ছেড়েছে বিশ্বযুদ্ধ। কত অপরিচিত জায়গায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে কত মানুষ, কেউ ফিরে এসেছে, কেউ ফেরেনি—রয়ে গেছে নতুন জায়গায়। ধীরে ধীরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে ওখানকার। এর অনেক কারণ। সেগুলো আলোচনা করার দরকার নেই এখানে, এটুকু জানলেই চলবে, ভাড়াটে সৈনিক রবার্ট জোনসও তেমনি একজন মানুষ। যুদ্ধের সময় ধরা পড়েছিল শত্রুর হাতে, দীর্ঘ দিন ছিল বন্দী-শিবিরে। তারপর শেষ হলো যুদ্ধ। এক এক করে খালি হয়ে গেল শিবিরগুলো। বন্দীদের কাউকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডে, কেউ বা মুক্তি পেয়ে ফিরে গেছে নিজের দেশে। কিন্তু জোনস আর গেল না। শিবিরে থাকার সময়ই শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সৎ আর হাসিখুশি স্বভাবের জন্যে অনেক বদমেজাজী সৈনিকও ভালবেসে ফেলল তাকে। তাদের ভাষা শিখে নিয়েছে জোনস, রয়ে গেল বিদেশেই। বন্ধুরা চাকরি জোগাড় করে দিল সামরিক অফিসার্স মেসে। উন্নতি করে ফেলল দ্রুত। সাধারণ চাকর থেকে উঠে গেল প্রধান-বাবুর্চির পদে। আলাবামার রবার্ট জোনস হয়ে গেল যেন খাঁটি জার্মান। ওই মেসেরই সদস্য ক্যাপ্টেন জুপনার। সে-ই ও-২২০তে নিয়ে এসেছে জোনসকে।

ছোট্ট বার্থে শুয়ে আছে জোনস। ঘুম ভেঙেছে। চোখ মেলতে মেলতেই আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল বড় করে। জানালার দিকে চোখ পড়তে তড়াক করে উঠে বসল। 'ঈশ্বর! দুপুর হয়ে গেছে! না খেয়ে থাকবে সবাই!'

সূর্য মাঝ আকাশে, দেখল জোনস। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে বেরিয়ে এল

ছোট ঘরটা থেকে। পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে আরেকবার তাকাল সূর্যের দিকে। বিড়বিড় করল, 'কোন বেলার খানা পাকাব! সকাল না দুপুরের?'

'বিড়বিড় করে কি বলছ, বব?' পেছনে শোনা গেল জ্যাসন গ্রিডলের গলা। তারও ঘুম ভেঙেছে এই মাত্র। বেরিয়ে এসেছে কেবিন থেকে।

ঘুরল জোনস। সে মুখ খোলার আগেই আবার বলল জ্যাসন, 'গুডমর্নিং। নাস্তা-টাস্তা পাওয়া যাবে?'

'নাস্তা!' দ্বিধা করছে জোনস। 'সত্যি নাস্তা চাইছেন, স্যার, নাকি লাঞ্চ?'

'নাস্তা। টোস্ট, ডিম আর কফি হলেই চলবে।'

'ঘড়ি খারাপ, না আমার মাথাই খারাপ, কে জানে! সূর্য মাথার ওপর, সাহেব চাইছেন নাস্তা,' বিড়বিড় করে বলে গলার জোর একটু বাড়িয়ে বলল, 'স্যার, সূর্য মাথার ওপরে। একবারে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেললেই তো পারেন?'

মুচকি হাসল জ্যাসন। 'সূর্য দেখে খেতে হলে চিরকাল শুধু লাঞ্চই খেতে হবে এখানে। যাও, নাস্তাই রেডি করো। আমি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরব। ভাল কথা, লর্ড গ্রেস্টককে দেখেছ?'

'না, স্যার, গতকাল থেকেই দেখছি না।...গতকালই তো, নাকি?'

'তার কেবিনেও তো নেই। ঠিক আছে, যাও তুমি।'

বিমানের আশেপাশে মিনিট পনেরো হাঁটাচলা করল জ্যাসন। তারপর ফিরে এল। জুপনার আর ডর্ফের ঘুমও ভেঙেছে। অপেক্ষা করছে ডাইনিং রুমে।

'গুডমর্নিং,' বলে উঠল জ্যাসন।

'ঘড়ি দেখে বলছ তো?' হেসে বলল জুপনার। 'মর্নিং কেন, ইভনিংও তো হতে পারে?'

'সত্যি,' বলল ডর্ফ, 'বড় আজব জায়গা! বারো ঘণ্টা হলো নেমেছি এখানে, অথচ দুপুরের কোন হেরফেরই হলো না। ঘড়ি না থাকলে বোঝাই যেত না, বারো ঘণ্টা না বারো মিনিট পেরিয়েছে।'

'আশ্চর্য পরিস্থিতি!' সায় দিয়ে বলল জ্যাসন। 'কেমন এক ধরনের অনুভূতি জাগে ভাবলেই, বুঝিয়ে বলা শক্ত।'

'যাকগে, ওসব নিয়ে আলোচনা করে ফায়দা নেই,' কথার মোড় ঘোরাল জুপনার। 'টারজান কোথায়? দেখেছ তাকে?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন। রবার্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে-ও দেখেনি।'

'আমি বেরিয়ে যেতে দেখেছি,' ডর্ফ বলল। 'সেটা প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগের কথা। বেশিও হতে পারে। মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল।'

'একা! কাজটা কি ঠিক করল!' চিন্তিত দেখাচ্ছে জ্যাসনকে।

'কি জানি!' মাথা নাড়ল ডর্ফ। 'আমার তো মনে হয়, পৃথিবীর কোন মানুষই এখানে নিরাপদ নয়! গত চার ঘণ্টা পাহারায় ছিলাম। যা দেখেছি! সঙ্গে কামান নিয়েও একা বেরোনো উচিত নয়। আর মি· টারজান কয়েকটা

তীর-ধনুক আর ছুরি নিয়ে বেরিয়েছেন। কাপড়-চোপড় কিছু ছিল না পরনে, শুধু চিতাবাঘের এক টুকরো ছাল জড়ানো কোমরে।'

'ওটাই তার ঐতিহ্যবাহী পোশাক,' বলল জুপনার। 'কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক-টন্দুক কিচ্ছু নেয়নি?'

মাথা নাড়ল ডর্ফ। 'ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস নিয়েছে। একটা দড়ি। কোমরে পেঁচিয়ে।'

'সেটা তো আর অস্ত্র হলো না,' বলল জুপনার। 'নিরাপদ নয় বলেছিলে কেন? কি দেখেছ?'

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপিনো ছেলেটা। তাকে বলল ডর্ফ, 'এই, কফি দে?'

কাপ পিরিচ সাজাল ছেলেটা। কেটলির দিকে হাত বাড়াতেই পাশ থেকে বলে উঠল জোনস, 'দাঁড়া, তুই পারবি না। আমিই বানিয়ে দিচ্ছি। সাহেবদেরকে তুই কাপগুলো এগিয়ে দিবি।'

কফির কাপে চুমুক দিল ডর্ফ। আয়েশের শব্দ তুলে বলল, 'চমৎকার বানিয়েছ। জ্যাসনের দিকে ফিরল। নিরাপদ নয় কেন? অদ্ভুত সব জন্তু-জানোয়ার দেখেছি। বাঘ-শুয়োর আর হাতির কথা ছেড়েই দিলাম। আরেকটা জীব, যা শুধু এতদিন সিনেমায় আর ছবির বইতেই দেখেছি—বিমানের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বিশাল এক পাখি। প্রথমে তো ভেবেছিলাম ড্রাগনই বুঝি। ছোট্ট মাথা, লম্বা গলা, বিশাল ঠোঁট—ধারাল দাঁতে বোঝাই। লম্বা লেজ। বাদুড়ের মত ডানা—ছড়ানো অবস্থায় বিশ ফুটের কম হবে না। শাঁ করে আকাশ থেকে নেমে এল ওটা। ছোঁ মেরে ভেড়ার মত একটা জীবকে অনায়াসে তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল। কি কাণ্ড! আরব্য রজনীর রুখ পাখিকেও যেন হার মানাল। স্বচ্ছন্দে মানুষ তুলে নিয়ে যেতে পারবে!'

মুচকি হাসল ফিলিপিনো ছেলেটা। তার দিকে চেয়ে রবার্টের চোখেও হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। দু'জনেই পালাল ডাইনিং রুম থেকে।

কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল জুপনার আর জ্যাসন।

'টেরোডাকটিল না তো?' বলল জুপনার।

'না,' মাথা নাড়ল ডর্ফ। 'তবে টেরানোডন জাতের কিছু একটা হতে পারে।'

'চিন্তার কথা!' বিড়বিড় করল জ্যাসন। জুপনারের দিকে তাকাল। 'টারজানের খোঁজে লোক পাঠানো উচিত। কি বলো?'

'ও-কি পছন্দ করবে সেটা?'

'শিকার করতে করতে যাবে দলটা। টারজানের সঙ্গে দেখা হলে বলবে, শিকারে বেরিয়েছে। আমার মনে হয়, সময় থাকতেই যাওয়া দরকার। বাঘ-সিংহ হলে এক কথা ছিল, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে একা কিছু করতে পারবেন না তিনি।'

'টারজানকে তুমি চেনো না, ডর্ফ, তাই এ কথা বলতে পারছ,' বলল জ্যাসন।

'বেশ,' বলল জুপনার। 'আর এক ঘণ্টা দেখব। এর মাঝে না ফিরলে বেরোতেই হবে আমাদেরকে।'

ওরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে, এই সময় এসে ঢুকল হাইন্স আর ফন হোর্স্ট। কথাবার্তা শুনে ওরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল টারজানের জন্যে। ঠিক করে ফেলল, যাবেই। আরেকটা প্রস্তাব দিল হাইন্স। ও-২২০ নিয়ে খোঁজার কথা বলল। কথাটা মন্দ না, তবে দুটো অসুবিধা আছে। এক ওরা আকাশে থাকতেই যদি টারজান ফিরে আসে? বিমানটা না দেখে কি ভাববে, কে জানে! দুই, পেলুসিডারের আকাশে নিশ্চয় অনেক উড়ুক্কু সরীসৃপ রয়েছে। ওই ভয়ানক জীবগুলোর মাঝে বিমান চালানো কতখানি নিরাপদ, জানে না ওরা। অবশেষে ঠিক হলো হেঁটেই যাবে। টারজান কোন্ দিকে গেছে ডর্ফ দেখেছে। বনে ঢুকে এগোনোর সময় চিহ্ন রেখে যাবে। ফেরার সময় অসুবিধা হবে না, যত গভীর বনই হোক। এরপর আলোচ্য বিষয়, কাকে কাকে নিয়ে কে কে যাবে।

'আমি আর হোর্স্ট ওয়াজিরি শিকারীদের নিয়ে যাই,' প্রস্তাব দিল জ্যাসন। 'ওরা জঙ্গল ভাল চেনে...'

'এখানকার জঙ্গল চেনে না,' বাধা দিয়ে বলল ডর্ফ।

'আমাদের চেয়ে অন্তত ভাল চিনবে। আমরা তো কোন জঙ্গলই চিনি না।'

জ্যাসনের কথায় সমর্থন জানাল জুপনার। 'তোমার প্ল্যানটা ভালই। তা ছাড়া, টারজানের পরে তুমিই ইন-চার্জ। তোমার নির্দেশ মেনে চলব আমরা।'

'না,' মাথা নাড়ল জ্যাসন, সেটা উচিত হবে না। নতুন জায়গা এটা। কোন কিছুর সঙ্গেই পরিচিত নই আমরা। একজনের ওপর নির্ভর না করে সবার পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়াই ভাল।'

'সেটাও একটা কথা বটে,' বলল জুপনার। 'টারজানেরও এই নীতি। এতে অনেক সুবিধা। অনেকগুলো মগজের পরামর্শ পাওয়া যায়। তা ছাড়া কারও মনে অসন্তোষও থাকে না।'

'গুড, তাহলে একথাই রইল,' ফন হোর্স্টের দিকে ফিরল জ্যাসন। 'লেফটেন্যান্ট, আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়! আমাকে বাদ দিয়ে যাবেন ভাবছিলেন নাকি?'

'বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। মুভিরো আর তার দলকে তৈরি হতে বলো। তীর-ধনুক ওদের বেশি পছন্দ, তা হোক। সঙ্গে রাইফেল নিতে বলে দেবে সবাইকে।'

'এই সেদিনও মুভিরো বলেছে,' বলল হাইন্স, 'রাইফেল ব্যবহার করে নাকি কাপুরুষে। সিংহ বা গণ্ডার শিকারের সময়ও ওরা বল্লম ব্যবহার করে।'

'তা করে,' বলল হোর্স্ট। 'কিন্তু আমি যা দেখেছি, যদি দেখে থাকে ওরাও, তাহলে শুধু রাইফেল নয়, কামান নিতে চাইবে সঙ্গে।'

'প্রচুর গুলি নিতে বলবে,' বলল জ্যাসন। 'খাবার নেয়ার দরকার নেই। জঙ্গলে প্রচুর আছে। শিকার করে নিতে অসুবিধা হবে না।'

তৈরি হয়ে নিল ওরা। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, টারজান ফিরল না। আর দেরি করতে চাইল না জ্যাসন। বিমানে যারা রয়ে গেল, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে চলেছে হোর্স্ট আর দশজন ওয়াজিরি যোদ্ধা।

প্রান্তর পেরিয়ে বনে ঢুকল দলটা। এদিক দিয়ে ঢুকেছে টারজান, বিমান থেকেই দেখিয়ে দিয়েছে ডর্ফ। এতক্ষণ আগে ছিল জ্যাসন আর হোর্স্ট, এবার মুভিরোকে সামনে থাকতে বলা হলো। জঙ্গলে অনুসরণ করার কাজে খুব দক্ষ সে।

চিহ্ন দেখে দেখে ঠিক এগিয়ে চলল মুভিরো। খানিক দূর গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল আশপাশটা। ফিরে চেয়ে বলল, 'এখান থেকেই গাছে চড়েছেন, বাওয়ানা টারজান। এরপর তাঁকে অনুসরণ করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'কি করি, বলো তো? চিন্তিত জ্যাসন।

'আফ্রিকা হলে আন্দাজেই এগিয়ে যেতে পারতাম,' বলল মুভিরো। 'সেখানে উনি একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলেন। গাছে গাছে সোজা এগোন। শিকারের দরকার হলে এগিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন পশুরা যে পথে চলাচল করে, তার পাশে। কিন্তু এটা নতুন জায়গা। নিশ্চয় আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাইবেন আগে। চিনে নেবেন বনটা।'

'তাহলে এখন সোজা এগোই আমরা,' বলল জ্যাসন। 'পরে ভেবেচিন্তে যা হোক কিছু একটা করা যাবে।'

'চলুন,' বিশেষ জোর নেই মুভিরোর কণ্ঠে।

আগে আগে চলল মুভিরো আর তিন ওয়াজিরি। মাঝে জ্যাসন আর হোর্স্ট। অন্যেরা পেছনে। জ্যাসনের হাতে কম্পাস। কিন্তু ওটা বিশেষ কাজ দিচ্ছে না এখানে। মাথার ওপরে স্থির সূর্য। দিক-নির্ণয় প্রায় অসম্ভবই মনে হচ্ছে তার কাছে।

'কি জঙ্গলরে বাবা! এত ঘন!' এক সময় বলে উঠল হোর্স্ট। 'এর মাঝে একটা মানুষকে খোঁজা আর খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা সমান কথা।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল জ্যাসন। 'খানিক পর পর একটা করে গুলি ছুঁড়লে কেমন হয়? টারজান শুনতে পেলে নিশ্চয় দেখতে আসবে কি ব্যাপার।'

'একটু ভুল বললে,' বলল জ্যাসন। 'খড়ের গাদায় সুচটা খুঁজে পাওয়ার তবু কিছু সম্ভাবনা থাকে। কারণ তাতে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু নেই, সুচটাকে তারা খেয়েও ফেলবে না।'

'আমার মনে হয় খানিক পর পর ফাঁকা আওয়াজ করা উচিত। টারজান কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয় দেখতে আসবেন ব্যাপার কি।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল জ্যাসন। 'রাইফেল ব্যবহার করব। রিভলভারের চেয়ে জোরাল হবে আওয়াজ।'

জ্যাসন কিংবা হোর্স্টের হাতে রাইফেল নেই, শুধু একটা করে ·৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট রিভলভার। ফাঁকা আওয়াজ করার নির্দেশ দেয়া হলো

এক ওয়াজিরিকে।

এক মিনিট পর পর তিন বার গুলি চালানো হলো। তারপর আবার এগোল দলটা। আধ ঘণ্টা পরও টারজানের কোন সাড়া নেই। আবার গুলি চালানোর নির্দেশ দিল জ্যাসন। এবারও বৃথাই। একটা চাপা অস্বস্তি ইতিমধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সবার মনে। আরও এগোবে?

এগিয়েই চলল ওরা। যত যা-ই হোক, কিংবা ঘটুক, টারজানকে খুঁজে বের করতেই হবে।

ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে বনের চেহারা। বড় বড় গাছগুলো আর তত গা ঘেঁষাঘেষি করে নেই। ঝোপঝাড়ও তত ঘন নয়। ফলে পথ-চলা খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এল দলটা। অনেক রকমে চেষ্টা করল, কিন্তু টারজানের কোন সাড়া পেল না। আলো সর্বক্ষণ এক রকম, সূর্য নড়েচড়ে না, সময়ের হিসেব রাখতেই ভুলে গেল ওরা।

একটা ব্যাপার, এতক্ষণ খুব একটা সাড়াশব্দ ছিল না বনের ভেতর। সামনে যতই এগোচ্ছে দলটা, নানারকম শব্দ এসে কানে ঢুকছে। বিচিত্র সে-সব আওয়াজ। চাপা গোঙানি, গরগর, গর্জন, ককানো, ফিসফিস, হিসহিস এমনি যত রকম আছে, সব শব্দের যেন মেলা বসেছে।

জ্যাসনের কাছে পিছিয়ে এল মুভিরো। 'বাওয়ানা, কিছুক্ষণ থেকেই হাতির গন্ধ পাচ্ছি। তবে আমার চেনা গন্ধের সঙ্গে পুরোপুরি মিলছে না।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন। 'চলো, এগোও। দেখি, আরেকটু এগিয়ে।

সামনে আরও পাতলা হয়ে এসেছে বন। জন্তু-জানোয়ার চলাচলের পথের ওপর এসে পড়ল ওরা। মাটিতে নানারকম দাগ। কোনটা চোখা খুরের, কোনটা ভারী মোটা পায়ের, আবার কোনটা বা ধারাল নখের আঁচড়ে হয়েছে।

এই সময় একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল জ্যাসন। এতক্ষণ চলার পথে গাছের গায়ে চিহ্ন রেখে রেখে এগোচ্ছিল ওরা, কিন্তু এখন আর তার দরকার মনে করল না। কারণ, আশেপাশে, সামনে পাতলা বন। পথ চলা আরও অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কাঁটা বা লতা আর নেই বললেই চলে। ঝোপঝাড় যা আছে, ওগুলো পথের দু'ধারে। এগোতে কোন অসুবিধে নেই। আরও কয়েক মাইল পেরিয়ে এল দলটা। সময় সম্পর্কে উদাসীন। নানা রকম পাখি আর ছোট জানোয়ার চোখে পড়ছে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল ভারী গর্জন।

থমকে দাঁড়াল জ্যাসন আর হোর্স্ট। ফিরে তাকাল মুভিরো। ইশারায় তাকে কাছে ডাকল দলপতি।

'কি ব্যাপার?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল জ্যাসন।

'মনে হয় বাঘ!' জবাব দিল মুভিরো। 'হাতিগুলোও কাছাকাছি আছে। গায়ের গন্ধ আরও বেড়েছে।'

'মুশকিলেই পড়লাম দেখছি!' অনিশ্চিত শোনাল হোর্স্টের কণ্ঠ।

'টারজানের দেখা নেই। ওদিকে হাতি আর বাঘের ডাকে বন গরম! কখন আক্রমণ করে বসবে কে জানে!'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মুভিরো।

আবার এগোনোর পালা। তবে এবার খুব ধীরে, সতর্ক হয়ে। সবার মনে একই দুশ্চিন্তা—কখন আক্রমণ করে বসে ভয়ানক জানোয়ারগুলো।

চলতে চলতে একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। বিশাল এক তৃণভূমি। লম্বা লম্বা ঘাস। একশো একরের মত হবে জায়গাটা, বেড়ার মত ঘিরে রয়েছে বন। ঝোপঝাড় প্রায় নেই। মাঝেমধ্যে এক আধটা গাছ জন্মে আছে মাঠে। চার পাশের বনের ভেতর থেকে অসংখ্য পায়ে চলা পথ এসে পড়েছে। নিশ্চয় জন্তু-জানোয়ার চরতে আসে।

শিগগিরই প্রমাণ মিলল সে অনুমানের। একটা পথ ধরে বিচিত্র এক শোভাযাত্রা এসে হাজির হলো মাঠে। এক ধরনের ষাঁড় এসেছে, ছড়ানো শিং। ঘন রোমশ শরীর। টাগ। ওগুলোর মাঝে মাঝে রয়েছে বড় লাল হরিণ। ঠিক পেছনেই হেলেদুলে বেরোল বিশালদেহী কয়েকটা ভালুকের মত জীব, বোধহয় ভূচর স্লথ। সামান্য বিরতি। তারপরেই একের পর এক বেরোতে থাকল বিরাট বিরাট দানব, ম্যাস্টোডন আর ম্যামথ হাতি। ছোটখাট পাহাড় বললেও চলে একেকটাকে। ম্যামথগুলোর ইয়া বড় বড় দাঁত। কতখানি শক্তি থাকলে ওগুলো এত অনায়াসে বয়ে বেড়ানো সম্ভব, ভেবে তাজ্জব হয়ে গেল এ যুগের দর্শকেরা।

'এমন দৃশ্য দেখেছ কখনও!' ফিসফিস করে বলল জ্যাসন। স্তম্ভিত হয়ে গেছে হোর্স্ট। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শুধু। মুখে রা নেই।

দু'জন শ্বেতাঙ্গের পাশে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুভিরো ও। বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুই চোখ।

'মুভিরো, কেমন বুঝছ?' বলল জ্যাসন।

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না বাওয়ানা!' চাপা গলায় বলল মুভিরো। 'আশ্চর্য এক দেশ! বিশ্বাসই করতে পারছি না, আমাদের মাথার ওপরে এখন চলছে ট্রাম-বাস-রেল-গাড়ি। আকাশে উড়ছে প্লেন। চাঁদ উঠছে, সূর্য ডুবছে। ভাগ্যিস, এখানে সূর্য ডোবে না! অন্ধকারে কিছুতেই রেহাই পেতাম না ওই ভয়ঙ্কর জীবের কবল থেকে!'

চেয়ে আছে ওরা। দেখছে জানোয়ারগুলোকে। প্রাগৈতিহাসিক সে-সব জীব, যা এর আগে কখনও কোন সভ্য মানুষ চর্মচক্ষে দেখেনি।

হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল জানোয়ারগুলো। ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার পেছনে তাকাচ্ছে, জঙ্গলের দিকে।

'বাওয়ানা!' মুভিরোর গলায় শংকা। 'মনে হয় হিংস্র জানোয়ার রয়েছে বনের ভেতরে। শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দেখেছেন, কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে জানোয়ারগুলো?'

ঠিকই বলেছে মুভিরো। শিগগিরই বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওগুলো। একটা দুটো নয়, শ'য়ে শ'য়ে। তিন দিক থেকে বেরিয়ে

অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলছে তৃণভোজী প্রাণীগুলোকে।

'দাঁতাল বাঘ!' আতঙ্কিত কণ্ঠ হোর্স্টের।

'একটাই উপায় আছে এখন আমাদের বাঁচার!' বলে উঠল মুভিরো। 'পেছন ফিরে দৌড় লাগানো।'

সবার একই ইচ্ছে। কিন্তু পা উঠছে না কারও। কি এক অজানা আকর্ষণে যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। কৌতূহল কিছুতেই পেছনে ফিরতে দিচ্ছে না তাদেরকে। আর কি ঘটে, দেখতে চাইছে।

আরিব্বাপরে! বলে উঠল হোর্স্ট। 'কত্ত বাঘ! এখনও বেরোচ্ছেই!'

ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে তৃণভোজীরা। কিন্তু নড়ছে না জায়গা ছেড়ে। যাবে কোন্‌দিকে? চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। যে আগে নড়বে, আগে মরবে।

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল বাঘের দল। প্রায় একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আটকে ফেলা প্রাণীগুলোর ওপর।

আক্রান্ত হয়ে রুখে দাঁড়াল তৃণভোজীরাও। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাতির পাল। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড লড়াই। কেউ কাউকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়, একমাত্র হরিণগুলো ছাড়া। যেদিক দিয়ে পারছে, ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে ওগুলো। একআধটা হয়তো বা বেরিয়ে যাচ্ছেও, কিন্তু বেশির ভাগই পারছে না। দাঁতাল বাঘের তলোয়ার দাঁতের আঘাতে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে গলা, থাবার ঘায়ে খুলি চুরমার হচ্ছে। টাগগুলো অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে মরছে না, লড়াই করছে প্রাণপণে। তবে হাতি আর স্লথগুলোর সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ হচ্ছে বাঘের। একের সঙ্গে একের লড়াই হলে স্লথ কিংবা হাতির সঙ্গে কয়েক মুহূর্তও টিকবে না ওই বাঘ, কিন্তু তা হচ্ছে না। একেকটা হাতিকে ঘিরে ধরেছে কয়েকটা করে বাঘ। বিশাল দাঁত দিয়ে বাঘকে গেঁথে ফেলছে হাতি, পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দিচ্ছে, কিংবা শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে হাড়গোড়। কিন্তু শেষ অবধি পরাস্ত হতেই হচ্ছে একাধিক শত্রুর কাছে।

বোবা হয়ে ওই মরণপণ লড়াই দেখছে মানুষেরা। তাদের দিকে চোখ নেই জানোয়ারগুলোর। কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না এ ভাবে।

দাঁতাল বাঘের ব্যূহ ভেদ করে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল একটা টাগ। ছুটল মানুষেরা যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। আতঙ্কে, খেপে অস্থির হয়ে আছে জীবটা। দু'পেয়ে জীবগুলোকে দেখে রাগ চরমে উঠল। সোজা তেড়ে এল তাদের দিকে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। দৌড় দেয়ার আর সময় নেই। রাইফেল তুলে গুলি করল এক ওয়াজিরি। টাগটার মাথায় লাগল গুলি। ছুটন্ত অবস্থায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুলির শব্দে চমকে উঠল জানোয়ারেরা। ফিরে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল হাতির পাল। নতুন আরেক দল তাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে, ধরেই নিল। তেড়ে এল কয়েকটা বিশালদেহী দানব।

প্রমাদ গুণল জ্যাসন। আর উপায় নেই। বনের দিকে দৌড় দিতেই হবে। কিন্তু সেটাও কতখানি সফল হবে, কে জানে! প্রায় একশো গজ পেরোতে হবে তাদেরকে, হাতিগুলো পৌঁছে যাওয়ার আগেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে চলবে না। তাড়াতাড়ি যা হোক একটা কিছু করতে হবে। ছুটে আসা দানবগুলোকে থমকে দেয়ার জন্যে এক ঝাঁক গুলি চালাতে বলল।

রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠল আকাশ-মাটি। কয়েকটা হাতি পড়ে গেল। বাকিগুলো থমকে গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। আবার ছুটল। তাদের পায়ের ভরে মাটি কাঁপছে। ওগুলোর পেছনে আবার শুরু হয়ে গেছে হাতি-বাঘে লড়াই। কয়েকটা বাঘ পায়ে পায়ে এগোচ্ছে হাতিগুলোর পেছনে। মানুষদেরকেও দেখছে। বোধহয় দ্বিধা করছে, কাকে আগে আক্রমণ করবে।

জ্যাসনের নির্দেশে ছুটতে শুরু করেছে দলটা। পেছনে দ্রুত এগিয়ে আসছে হাতির পাল। আবার গুলি চালানোর আদেশ দিল জ্যাসন।

পড়ে গেল আরও কয়েকটা হাতি। থমকে গেল বাকিগুলো। ইতিমধ্যে পেছনে আসা বাঘগুলো পৌঁছে গেল। সামনে পেছনে শত্রু, তার ওপর রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজে ভড়কে গেল হাতিরা। দিশেহারা হয়ে পড়ল। এই সুযোগে ছুটতে ছুটতে খোলা প্রান্তর পেরিয়ে এল মানুষেরা।

সামনে এক বিশাল গাছ দেখতে পেয়ে সোজা ওটার দিকে ছুটে গেল জ্যাসন। চেঁচিয়ে অন্যদেরকে গাছে উঠতে বলে নিজেও তরতর করে উঠতে শুরু করল। গাছের কাছে এসে পড়ল একটা ম্যামথ। ছুটে এল জ্যাসনকে লক্ষ্য করে।

অন্য কোন দিকে নজর দেয়ার সুযোগ নেই আর। জ্যাসনের একমাত্র লক্ষ্য, হাতিটার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া। হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। এক দোল দিয়েই উঠে গেল ওপরে। ওই মুহূর্তে গাছের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল যেন পাহাড়। থরথর করে কেঁপে উঠল গাছ। আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিল জ্যাসন।

হোর্স্ট কিংবা দলের আর সবাই কোন্ দিকে গেল না গেল, নজর দেয়ার সময় নেই জ্যাসনের। উঠে যাচ্ছে ওপরে, আরও ওপরে। কিন্তু ওপরে উঠেও বাঁচতে পারবে কি? কয়েকটা হাতি একযোগে চেষ্টা চালালে গাছটাই হয়তো উপড়ে ফেলবে, কিংবা গোড়ার কাছ থেকে মুচড়ে ভেঙে ফেলবে।

গাছের মগডালে চড়ে বসল জ্যাসন। এইবার চারপাশে তাকানোর সময় পেল। প্রথমেই তাকাল নিচের দিকে, সঙ্গীরা কে কোথায় আছে দেখছে। কাউকে চোখে পড়ল না। খালি জানোয়ার আর জানোয়ার। ছোট-বড় সব ধরনের সব আকারের। কেউ প্রাণের ভয়ে ছুটছে, কেউ শিকারকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। হয়তো গভীর বনে ঢুকে গেছে। কিংবা তারই মত উঠে পড়েছে গাছে। নিচের নরক গুলজার না থামলে আর খোঁজ খবর করা যাবে না।

প্রান্তরের দিকে তাকাল জ্যাসন। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বেশির ভাগ হাতি, ষাঁড় আর হরিণ মারা পড়েছে। গোটা দুই স্লথ এখনও জ্যান্ত আছে, লড়ে যাচ্ছে

দাঁতাল বাঘের সঙ্গে। তবে আর বেশিক্ষণ টিকবে না লড়াই। বাঘেরা জিতছে। শিকার ছিঁড়ে খেতে বসে গেছে অনেকেই। ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার। এত প্রাণী মারার দরকার নেই, খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তবু অহেতুক খুন করছে হাতি আর ষাঁড়গুলোকে। পালিয়ে বাঁচতে দিচ্ছে না কাউকে।

বনে ঢোকা জন্তুর সংখ্যা কমে এসেছে। কিন্তু বিশাল হাতিটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়। জ্যাসনের দিকে নজর নেই। গাছের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছে। আট-নয়টা দাঁতাল বাঘ ঘিরে রেখেছে ওটাকে। আক্রমণ করে বসবে যে কোন সময়।

হাতিটার রোমশ শরীর বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের স্বাক্ষর। চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে। জানোয়ারটার জন্যে করুণা জাগল জ্যাসনের মনে। কিন্তু করার কিছু নেই। তার কাছে মাত্র একটা রিভলভার রয়েছে। এর গুলিতে কিছুই হবে না ভয়ানক দাঁতাল বাঘের।

আট-ন'টা বাঘও আক্রমণ করতে দ্বিধা করছে হাতিটাকে। হঠাৎ অদ্ভুত এক কাণ্ড করল দলের সবচেয়ে বড় বাঘটা। প্রান্তরের দিকে চেয়ে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকাল বাঘেরা। কয়েকটা খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে আসতে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে।

কমপক্ষে কুড়িটা বাঘ এখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে হাতিটাকে। দলপতির কাছ থেকে নির্দেশ আসতেই একযোগে আক্রমণ করে বসল। চাপা গর্জন করে রুখে দাঁড়াল হাতিটাও। আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা চালাল। এতবড় পাহাড়-সমান দেহটার ক্ষিপ্রতা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

চোখের পলকে একটা বাঘকে দাঁতে গেঁথে ফেলল হাতিটা। পরক্ষণেই আরেকটাকে। পা তুলে দিল একটা বাঘের ওপর। দেখতে দেখতে তিনটে বাঘকে শেষ করে দিল। পাক খাচ্ছে চরকির মত। ছেঁকে ধরা বাঘগুলোকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিচ্ছে গা থেকে। যেটাকে যেভাবে পারছে, শেষ করে দিচ্ছে। একটাকে ফুটবলের মত লাথি মেরে উড়িয়ে দিল শূন্যে। ওটা মাটিতে পড়তে না পড়তেই আরেকটাকে লাথি মারল একই ভাবে। কিন্তু এত করেও রেহাই পাচ্ছে না বেচারা। চারদিক থেকে সমানে দাঁত আর নখের আঘাত লাগছে শরীরে। রোমশ চামড়া চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। রক্তের নদী বইছে যেন।

হঠাৎ এক সঙ্গে তিনটে বাঘ লাফিয়ে উঠে বসল হাতির পিঠে। অন্যগুলো আক্রমণ চালাল দু'পাশ থেকে।

ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে বাঘগুলোকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল হাতিটা। পারল না। এবারে বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে ওটার ক্ষমতা। কিন্তু না। জ্যাসনকে অবাক করে আশ্চর্য এক কাণ্ড করল ম্যামথ। শুয়ে পড়ে গড়াতে শুরু করল। তার বিশাল শরীরের তলায় পড়ে চিড়ে-চ্যাপ্টা হতে লাগল বাঘের দল। আনন্দ নিজের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠল জ্যাসন।

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না হাতিটা। আরও বাঘ এসে হাজির হলো সঙ্গীদের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন শুনে। কতক্ষণ আর লড়াই করবে একটা ম্যামথ? অবশেষে যা ঘটার তাই ঘটল। বীরের মত প্রাণ দিল আধুনিক হাতির প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব পুরুষ।

চোখের পলকে হাতিটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল বাঘেরা। খেতে শুরু করে দিল মহানন্দে।

শত্রু কিংবা শিকার আর নেই আশেপাশে। খাওয়া নিয়ে এক সময় নিজেদের মাঝেই লড়াই বাধিয়ে দিল বাঘেরা। দুর্বলেরা মরতে লাগল সবলের হাতে। খাবারের অভাব নেই। তবু এই আদিম হিংস্রতা, লোভ আর ঈর্ষা দমন করতে পারছে না জানোয়ারগুলো।

হাতি আর ষাঁড় যা মরছে, বাঘও তার চেয়ে কম মরল না। বনের ভেতর থেকে এখন বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন প্রাণী। শ'য়ে শ'য়ে বাঘেদের কাছ থেকে দূরত্ব রজায় রেখে গোল হয়ে ঘিরে বসল তারা। আধুনিক শেয়াল, বুনোকুকুর আর হায়েনার পূর্বপুরুষ। উচ্ছিষ্টের আশায় বসে আছে লম্বা লাল জিভ বের করে।

চার

এগিয়ে আসছে দাঁতাল বাঘ। টারজান বুঝল, আর রেহাই নেই। এখানে এই পাতালের জগতে আর কয়েক সেকেন্ড পরেই মৃত্যু ঘটবে তার। ঠেকানোর সাধ্য নেই। বাধা যে দেবে, লড়ে মরবে, তারও উপায় নেই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বাঘ। তার প্রতিটি পেশী, দাঁত, জ্বলন্ত চোখকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে টারজান। এই অন্তিম মুহূর্তেও জানোয়ারটার প্রচণ্ড শক্তির কথা ভেবে অবাক হচ্ছে।

আরও কাছে এসে গেল বাঘ। মাত্র কয়েক ফুট দূরে। তলোয়ারের মত দাঁতের একটা কোপই যথেষ্ট, তলপেট থেকে বুক পর্যন্ত চিরে যাবে টারজানের, নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলে পড়বে মাটিতে।

হঠাৎ অতি ক্ষীণ একটা শব্দ কানে ঢুকল টারজানের। পাতা নড়ার শব্দ। বাঘটাও থমকে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। বোধহয় গাছের ডালে কোন কিছু চোখে পড়েছে।

মাথা নিচে, তাই ওপরের দিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না টারজান। আবছমত চোখে পড়ল ঘন পাতা সরিয়ে উঁকি দিয়েছে গরিলা আর মানুষের মাঝামাঝি একটা মুখ। রোমশ। টকটকে লাল চোখ। বিকট চেহারা।

সরসর করে আরও পাতা নড়ার শব্দ উঠল ওপরে চারপাশে। একে একে উঁকি দিল আরও অনেকগুলো মুখ। দাঁতাল বাঘটার দিকে চেয়ে আছে জ্বলন্ত চোখে।

গরগর করে উঠল বাঘ। ধমক দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। আবার এগোল টারজানের দিকে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মনের ভাব বোধহয়, আয়, কোন্ হারামজাদা আমার শিকার ছিনিয়ে নিবি, আয়! তার এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করল না দু'পেয়েরা। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি ভারী ভারী মুগুর ছুটে এল একের পর এক। দুপদাপ আঘাত হানতে লাগল বাঘের শরীরের এখানে ওখানে। গর্জে উঠল বাঘ। আরেকটা মুগুর এসে লাগল মাথায়। চেঁচিয়ে উঠে এক লাফে পিছিয়ে গেল।

এই সময় টান পড়ল টারজানের পায়ের দড়িতে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল তার শরীরটা।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। গর্জে উঠল আবার। ছুটে এল বাঘ। হ্যাঁচকা টানে অনেকখানি উঠে গেল টারজানের শরীর। বাঘের নাগালের বাইরে চলে এসেছে মাথা। নিচে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল জানোয়ারটা। আরও কয়েকটা মুগুর উড়ে এল তার দিকে। গায়ে লাগতেই আবার লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। আরও গোটা তিনেক মুগুরের বাড়ি খাওয়ার পর নিরস্ত হলো। মুখের ভাব দেখে মনে হলো, আঙুল ফল টক ভাবছে। মানুষ ধরার আশা বাদ দিয়ে আবার গিয়ে বসল ষাঁড়ের কাছে। খেতে শুরু করল।

মোটা এক ডালে তুলে নেয়া হয়েছে টারজানকে। ইতিমধ্যে দু'দিক থেকে চেপে ধরা হয়েছে তার দুই হাত। একটা গরিলা তার মাথা সই করে মুগুর তুলল। সেরেছে! দাঁতাল বাঘের কবলে মরাই ভাল ছিল এই মাথা ছাতু হওয়ার চেয়ে, ভাবল টারজান।

'কা-গোদা!' চেঁচিয়ে উঠল মুগুরধারী।

চমকে উঠল টারজান। বনমানুষের ভাষা! শত্রুকে কাবু করে মেরে ফেলার আগে জিজ্ঞেস করল বনমানুষ বীর: কা-গোদা। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করছ!

'কা-গোদা!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জীবটা।

মাথা ঝাঁকাল টারজান। বনমানুষের ভাষায় জবাব দিল, আত্মসমর্পণ করছে।

তাজ্জব হয়ে গেল জীবটা। শত্রুকে মেরে ফেলার আগে প্রশ্ন করা তাদের সমাজে রীতি। কিন্তু মানুষ তাদের ভাষা বোঝে না, জবাব দিতে পারে না। এই মানুষটা তার ভাষা বুঝতে পারছে, জবাব দিতে পেরেছে!

'কে তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করল মুগুরধারী।

'আমি টারজান, বনের রাজা। মস্ত শিকারী, অনেক বড় যোদ্ধা।'

'মওলাটের দেশে কেন এসেছ?'

'বেড়াতে। আমি বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে কোন বিবাদ নেই।'

আরও কয়েকটা গরিলা-মানব এসে ভিড় করল টারজানের আশেপাশে। মানুষটাকে কথা বলতে দেখে সবাই অবাক। তাদের ভারে ঝুলে পড়েছে ডাল।

'সাগোটদের ভাষা শিখলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আগের গরিলা-

মানব। 'এর আগেও অনেক গিলাক ধরেছি আমরা। তারা কেউই তোমার মত কথা বলতে পারত না।'

'শিখেছি আমার মায়ের কাছে,' জবাব দিল টারজান। 'ধাই মা। বনমানুষের মাঝে মানুষ হয়েছি আমি। শুধু তোমাদের না, যে কোন বানর, গরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জির ভাষা আমি জানি।'

'হুঁ! গরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জির নাম শুনিনি! তুমি কোন্ জাত?' মুগুর নামিয়ে নিল গরিলা-মানব।

'মানুষ। তবে বড় হয়েছি কারচাকের দলে।'

'কারচাক! না, তার নামও শুনিনি!'

'ব্যাটা বোধহয় মিছে কথা বলছে,' বলে উঠল আরেক সাগোট। 'পেটাও ওকে। মেরেই ফেলো। ও একটা গিলাক ছাড়া আর কিছু না।'

আরেকজন বলে উঠল, 'এখানে মারার দরকার নেই। চলো মওলাটের কাছে নিয়ে যাই। গাঁয়ের সকলের সামনে, মওলাটের সামনে মারব।'

'ঠিক। ঠিক বলেছ,' সায় দিল কয়েকজন।

টারজানকে তুলে ধরল কয়েকজন সাগোট। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিল একজন। এবার নামাতে হবে গাছ থেকে। কিন্তু বাঘটা এখনও যায়নি। ষাঁড় খাচ্ছে, আর মাথা তুলে মাঝে মাঝে দেখছে। তাড়াতে হবে আগে ওটাকে।

গাছে গাছে এগিয়ে গেল কয়েকজন সাগোট। মুগুর ছুঁড়ে মারতে লাগল বাঘটাকে লক্ষ্য করে। বার কয়েক গর্জে উঠে ধমক দিল বাঘ। শেষে বিরক্ত হয়ে পড়ল। পেটও ভরেছে। বসে থেকে খামোখা অপমান হওয়ার কোন মানে হয় না। আরেকবার জোরাল গলায় ধমক দিল, তারপর উঠে পড়ল। ধীরে সুস্থে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপের ভেতর।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সাগোটরা। তারপর টপাটপ লাফিয়ে নামতে শুরু করল গাছ থেকে। কয়েকজন নেমে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। যদি বাঘটা আবার আসে!

কিন্তু এল না বাঘ। সত্যিই চলে গেছে। আড়ালে-আবডালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই। পায়ে পায়ে মরা ষাঁড়ের দিকে এগোল সাগোটরা। অন্যরাও নামছে গাছ থেকে। টারজানকেও নামানো হলো। ষাঁড়টার অনেকখানি অবশিষ্ট রয়েছে এখনও। বিশাল জীব। পুরোটা খেয়ে শেষ করা এক দাঁতাল বাঘের কর্ম নয়।

রসাল চমৎকার মাংস। খেতে বসে গেল সাগোটরা। কাছেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে টারজান। এতক্ষণে ভালমত দেখার সুযোগ পেল জীবগুলোকে।

বেঁটেখাট, লম্বার তুলনায় অনেক বেশি মোটা। সারা গায়ে বড় বড় রোম। গরিলাদের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। তবে পায়ের মিল মানুষের সঙ্গে বেশি। মুখটা কুৎসিত, লম্বাটে। মাথা বেশ বড়, তারমানে মগজ বেশি, বুদ্ধি আছে। অন্তত বনমানুষদের চেয়ে বেশি তো হবেই। তবে অনেক বেশি

হিংস্র। পরনে কিছু নেই। খালি গা। মুগুর ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই সঙ্গে।

সাগোটদের খাওয়া শেষ। এখনও অনেক মাংস রয়ে গেছে। টারজানকে ধরে তুলল দু'জন সাগোট। বয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই পায়ের বাঁধন খুলে দিল। দড়ি বাঁধা কোরবানির পশুর মত হাঁটিয়ে নিয়ে চলল আগেপিছে থেকে। সত্যি, বুদ্ধি আছে ব্যাটাদের।

পায়ে চলা পথ ধরে এগোচ্ছে দলটা। এ পথেই এসেছিল টারজান। ওদের সঙ্গে চলতে চলতে বনমানুষের দলের কথা মনে পড়ল তার, মনে পড়ল বোলগানির কথা, টারকজের কথা। ওরা ছিল তার চিরশত্রু। সামান্য একটা ছুরি দিয়ে···ছুরি! হ্যাঁ, কোমরে আছে ছুরিটা। তীর-ধনুক নেই। ফাঁদে পড়েছিল যখন, তখনই ছুটে গিয়েছিল হাত থেকে। উল্টো হয়ে ঝোলার সময় তূণ থেকে পড়ে গেছে তীরগুলো। অস্ত্র একটা আছে সঙ্গে। কোনমতে হাতের বাঁধন খুলতে পারলেই···

টারজানের ভাবনায় বাধা পড়ল। মুগুর হাতে একটা মরা গাছের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক সাগোট। ঢাকে বাড়ি মারার মত মুগুর ঘুরিয়ে বাড়ি মারল গাছের গুঁড়িতে—শব্দ শুনেই বোঝা গেল ফাঁপা। গম্ভীর জোরাল আওয়াজ উঠল।

ঢিম! ঢিম! ডিম!

সেজদার ভঙ্গিতে বসে পড়ে মাটিতে কান পাতল লোকটা। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে।

সাগোটদের চেয়েও শ্রবণশক্তি প্রখর টারজানের। মাটিতে কান পাততে হলো না, বাতাসেই শব্দগুলো ভেসে এল তার কানে। তবে খুব ক্ষীণ। বহু দূর থেকে ওই সাগোটটার মতই মুগুর দিয়ে ফাঁপা গাছের গায়ে বাড়ি মারছে কেউ। একবার···দু'বার···তিনবার!

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাগোটটা। ফিরে সঙ্গীদেরকে জানাল সংবাদ।

একে একে আবার গাছে উঠে পড়ল ওরা। টারজানকেও তুলে নিয়েছে। অপেক্ষা করছে কারও আসার।

চুপচাপ বসে আছে সবাই। এক সময় বলল টারজান, 'আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি তো শত্রু নই।'

পাশের সাগোটটা ডাকল দূরে বসা আরেকজনকে, যে টারজানকে মারার জন্যে মুগুর তুলেছিল। বোঝা যাচ্ছে, সে-ই দলটার সর্দার। বলল, 'টারগাস, বাঁধন খুলে দিতে বলছে গিলাকটা।'

বন্দীর দিকে এক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল টারগাস। তারপর বলল, 'খুলে দাও।'

আপত্তি করল একজন 'কেন?'

'যেহেতু আমি বলছি, টারগাস বলছি।'

'তুমি বলার কে? তুমি রাজা নও। মওলাট যদি বলে তবেই খোলা হবে।'

'মওলাট হই বা না হই আমি টারগাস। আর টারগাস বলছি বাঁধন খুলে দিতে।'

ডালে দোল দিয়ে লাফিয়ে এসে টারজানের পাশে নামল টোইয়াড, যে আপত্তি করেছিল। চেঁচিয়ে উঠল, 'টারগাসের হুকুম আমি মানি না।'

খেপে গেল টারগাস। লাফিয়ে এসে পড়ল টোইয়াডের পাশে। টিপে ধরল তার গলা। শুরু হয়ে গেল জাপটা-জাপটি খামচা-খামচি, মাঝে মাঝে কামড়া-কামড়িও। হুড়োহুড়ি করতে করতে ডাল থেকে নিচে পড়ে গেল ওরা। তবে মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলল আরেকটা ডাল। ওখানে চলল আরেক দফা মারামারি। তারপর পড়ল মাটিতে।

চলল আরও কিছুক্ষণ মারামারি। হঠাৎ এক ল্যাঙ মেরে টোইয়াডকে মাটিতে ফেলে দিল টারগাস। উপুড় করে ফেলে চেপে বসল শত্রুর পিঠে। চেঁচিয়ে বলল, 'কা-গোদা!'

ফ্যাসফ্যাসে গলায় জবাব দিল টোইয়াড। আত্মসমর্পণ করেছে।

শত্রুর পিঠ থেকে উঠে এল টারগাস। তরতর করে উঠে পড়ল আবার গাছে। এক সঙ্গীকে আদেশ দিল, 'গিলাকের বাঁধন খুলে দাও।'

আর কেউ আপত্তি করল না। বাঁধন খুলে দেয়া হলো টারজানের।

কড়া গলায় বলল টারগাস, 'ছেড়েছি বটে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা করলেই মেরে ফেলব।'

দূরে একটা শব্দ শোনা গেল।

'ওরা আসছে,' বলল টারগাস।

'হ্যাঁ,' বলল আরেকজন, 'দল নিয়ে আসছে মওলাট।'

এল ওরা। রাজা মওলাট কোনজন, চিনতে অসুবিধা হলো না টারজানের। দলের আগে আগে হেঁটে আসছে বিশালদেহী এক রোমশ দানব। হাতের আকার দেখেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি রাখে গায়ে। বয়সও হয়েছে। মুখের রোমগুলো সাদা হয়ে এসেছে।

গাছ থেকে নামল সাগোটটা।

ফুট বিশেক দূরে থাকতেই বলে উঠল রাজা, 'আমি মওলাট। সঙ্গে আছে আমাদের সাগোটরা।'

এ পাশের দলপতি জবাব দিল; 'আমি টারগাস। সঙ্গে আছে সাগোট শিকারীরা।'

অভ্যর্থনার পালা শেষ হলো। হিংস্র চোখে টারজানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মওলাট, 'ওটা কে?'

'একটা গিলাক। ফাঁদে পড়েছে,' জবাব দিল টারগাস।

রেগে গেল রাজা। কড়া গলায় ধমকে উঠল, 'একটা গিলাক খেতে ডেকে আনা হয়েছে আমাদেরকে? কেন, ওটার পা নেই? হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি?'

'না, রাজা, এজন্যে ডাকা হয়নি। অন্য খাবার আছে। এসো আমার সঙ্গে,' বলল টারগাস।

দুটো দল একত্রিত হলো। এগিয়ে চলল টারগাসের পিছু পিছু। দলের সবাই খুশি। গিলাক তো রয়েছেই, এ ছাড়া আরও অনেক খাবার! চমৎকার!

মেয়ে আর বাচ্চারা লোভাতুর চোখে দেখছে টারজানকে। তাকে ঘিরে এগোচ্ছে কলরব করতে করতে। টারজান লক্ষ করল, রাজার পাশে হাঁটছে টোইয়াড। তাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা আগে রয়েছে টারগাস। ফিসফিস করে কি যেন বলছে টোইয়াড। নিশ্চয় টারগাসের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে।

শংকিত হয়ে উঠল টারজান। বুঝতে পারছে, শিগগিরই একটা গোলমাল বাধবে। বিপদে পড়তে যাচ্ছে টারগাস, সেই সঙ্গে টারজানও।

হঠাৎ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল রাজা। শক্ত করে মুগুর চেপে ধরে ছুটল টারগাসের দিকে। পেছন থেকেই গুঁড়িয়ে দেবে মাথা। অথচ ওই সাগোটটাই খবর পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে এনেছে খাবারের কাছে। নির্দ্বিধায় টারগাসের পক্ষ নিল টারজান। একবার তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে সাগোটটা, তাকে বাঁচানো কিংবা সাহায্য করা তার কর্তব্য।

আশেপাশে ঘিরে আছে মেয়েরা। হাতের এক ধাক্কায় কয়েকটাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ছুটল টারজান। চেঁচিয়ে উঠল 'ক্রী-আগ, টারগাস!' অর্থাৎ, টারগাস, সাবধান!

পাঁই করে ঘুরল টারগাস। দেখল মুগুর হাতে পৌঁছে গেছে রাজা। ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। রাজার আক্রমণ প্রতিহত করবে? একটাই ফল হবে রাজার গায়ে হাত তুললে। সবাই মিলে একযোগে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে তাকে।

টারগাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাজা। কোন রকম জিজ্ঞসাবাদের প্রয়োজন মনে করল না। বাড়ি মারার জন্যে মাথার ওপরে তুলল মুগুর।

ঠিক এই সময় পৌঁছে গেল টারজান। পেছন থেকে খপ করে মুগুরটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল রাজার হাত থেকে। ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এত বড় বেয়াদবি! কার এত সাহস! বাঘের মত গর্জে উঠল রাজা। ঘুরল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে গিলাকাটা। রাগে চেঁচিয়ে উঠল 'গি-লা-ক! এতবড় সাহস তোর! রাজার মুগুর ছিনিয়ে নিস! আজ তোকে টেনে টেনে ছিঁড়ব!' দু'হাত বাড়িয়ে টারজানকে জড়িয়ে ধরতে এল মওলাট।

অন্য সাগোটরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা সাধারণ গিলাক সাগোট রাজাকে আক্রমণ করার সাহস রাখে! যা-তা কথা! তবে জানে ওরা, শেষ অবধি রাজার হাতে মৃত্যু ঘটবে গিলাকটার। তাই ওরা আর এগোল না।

মওয়াটের আলিঙ্গন দৃঢ় হওয়ার আগেই পিছলে বেরিয়ে গেল টারজান। এক পাশ থেকে খপ করে চেপে ধরল বিশাল হাতের কব্জি। জুজিৎসুর কায়দায় এক মোচড় দিয়ে দড়াম করে আছড়ে ফেলল মাটিতে। লাফ দিয়ে সরে গেল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাজা। 'গাঁক-গাঁক' করে উঠল ভীষণ রাগে। তার লাল চোখে বিস্ময়। এত বয়েস হয়েছে, এত অভিজ্ঞতা, কিন্তু এমন আশ্চর্য গিলাক আর কখনও দেখেনি। আবার দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে এল সে। হাতের আঙুল ছড়ানো। বেয়াদব গিলাকের গলা টিপে ধরবে।

তাকে কাছে আসতে দিল টারজান। হঠাৎ দু'হাত বাড়াল সামনে।

রাজার আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিল।

জাপানী কায়দায় চাপ লাগতেই রাজার বিস্ময় পরিণত হল আতঙ্কে। মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে আঙুল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল কুৎসিত মুখ। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে এখন।

কয়েকটা আঙুল ভেঙে দিয়ে রাজার হাত ছেড়ে দিল টারজান। দু'হাতের তালু জড় করে পাশ থেকে দা দিয়ে কোপানোর মত করে মারল রাজার পেটে।

হাঁ হয়ে গেল মওলাট। দম নিতে পারছে না। হাঁসফাঁস করছে শুধু। চেঁচিয়ে যে আদেশ দেবে দলের লোককে, সে উপায়ও নেই।

আবার রাজার একটা হাত চেপে ধরল টারজান। মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দশ হাত দূরে। ধুপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারী দেহটা। কুঁকড়ে গেছে রাজা। কোমর-ভাঙা কুকুরের মত একই জায়গায় ঘুরতে শুরু করল, কুঁই কুঁই শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে।

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে পেল সাগোটরা। একা আক্রমণ করলে কি অবস্থা হবে, জানা হয়ে গেছে ওদের। মাথার ওপর মুগুর তুলে ধরল প্রায় এক কুড়ি লোক। ঘিরে ফেলতে লাগল টারজান আর টারগাসকে। তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে টোইয়াড।

টারজান বলল, 'টারগাস, আমরা কি লড়াই করব?'

'এতগুলোর সঙ্গে দু'জনে পারবে না,' জবাব দিল টারগাস।

'কিন্তু করারও কিছু নেই। তুমি গিলাক না হলে, গাছে চড়তে জানলে, ছুটে পালাতে পারতাম। তা যখন পারবে না, লড়াই করতেই হবে।'

'আমি গাছে চড়তে পারি। পথ দেখাও।'

'এসো,' বলেই ছুটল টারগাস। তার পিছু নিল টারজান। সাগোট-যোদ্ধাদের ব্যূহ ভেদ করল চোখের পলকে। তার আগে দুই দানবের ভীম আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তিন যোদ্ধা।

তরতর করে বিশাল এক গাছে চড়তে লাগল টারজান। ঠিক তার পেছনেই টারজান। সামান্য দ্বিধা নেই, চড়তে এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না। পেছন হৈ-হৈ করে তেড়ে আসছে যোদ্ধারা।

গাছের অনেকখানি ওপরে উঠে ফিরে তাকাল টারগাস। ঠিক তার পিঠের কাছেই রয়েছে আশ্চর্য গিলাকটা। এতখানি আশা করেনি সে। টারজানকে অনুসরণ করতে বলে ছুটল সে ডালে ডালে।

শিগগিরই আবিষ্কার করল টারগাস, গাছের ওপরে ছোটায়ও তার চেয়ে এক কাঠি সরেস এই গিলাকটা। লতায় লতায় দোল খেয়ে যেন উড়ে চলেছে।

একটা জায়গায় এসে থেমে গেল টারজান। নিচে মাটিতে পড়ে আছে তার ধীর-ধনুকগুলো, এখানেই ফাঁদে আটকা পড়েছিল সে। তাড়াতাড়ি নেমে তুলে নিল ওগুলো। আবার ছুটল।

পেছনে খানিকক্ষণ তাড়া করে এল সাগোট যোদ্ধারা। বুঝতে পারল, দুই

শত্রুকে ধরা তাদের কর্ম নয়। তা ছাড়া ষাঁড়ের মাংস দেখে এসেছে ওরা। খাওয়া ফেলে অহেতুক ছোটাছুটি করে হয়রান হওয়ার কোন যুক্তি নেই। অতএব ফিরল ওরা।

পেছনে আর হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে না। আরও খানিকক্ষণ ছুটল দু'জনে। তারপর বড় একটা গাছের ডালে এসে থামল টারগাস। টারজানকে থামতে বলল।

টারজান কাছে আসতেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আমি টারগাস।'

'আমি টারজান,' বুঝে গেছে সে, হাজার পরিচয় থাকলেও এ ভাবেই কথা শুরু করে সাগোটরা।

'আমায় হুঁশিয়ার করলে কেন, টারজান? বাঁচালে কেন?'

'কারণ তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে। বাঁধন খুলে দিয়েছিলে।'

'সাগোটদের দেশে কেন এসেছ তুমি?'

'বলেছিই তো, বেড়াতে। শিকার করতে।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'আমার লোকজনের কাছে।'

'কোথায় তারা?'

তাই তো, কোথায় তারা? এতক্ষণে মনে পড়ল টারজানের, কোন চিহ্ন রেখে আসতে পারেনি। মাথার ওপরে স্থির সূর্য। দিক ঠিক করা মুশকিল। চারদিকে বড় বড় গাছ। সবই প্রায় একরকম দেখতে। ও-২২০ কোন্‌দিকে, কতদূরে আছে বলতে পারবে না টারজান। বনেই পথ হারিয়েছে বনের রাজা।

পাঁচ

গাছে বসে রোমহর্ষক দৃশ্য দেখছে জ্যাসন গ্রিডলে। হাতি আর ষাঁড়ের মাংস যেভাবে খুশি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে দাঁতাল বাঘের দল। রক্তে লাল হয়ে উঠেছে সবুজ ঘাসের প্রান্তর।

হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে গেল কি করে প্রাগৈতিহাসিক বিশাল প্রাণীরা, এটা বিজ্ঞানীদের কাছে এক মস্ত রহস্য। কিন্তু তাঁরা যদি এখন এ দৃশ্য দেখতেন, তাহলে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেন। এই একটা দিনেই ঘটল এতগুলো হত্যাকাণ্ড। এ ভাবে নিশ্চয় চলে এসেছে দিনের পর দিন। এরপর কোন এক যুগের প্রাণীকুল বিলুপ্ত হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সৃষ্টির সেই ঊষালগ্ন থেকে, যেদিন প্রাণ এসেছে পৃথিবীর বুকে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে হিংস্রতা। এক ধরনের অ্যামিবা আরেক ধরনের অ্যামিবাকে খেয়ে ফেলেছে। জন্ম নিয়েছে একদিন মাছ। ওদেরও সেই একই ব্যাপার, একে অন্যকে ধরে খাওয়ার প্রবণতা। তারপর এল সরীসৃপ, হিংস্রতা

আরও বাড়ল। শেষে এল স্তন্যপায়ীরা। চরমে উঠল হিংস্রতা আর খুনখারাপি। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার এটা একটা মস্ত কারণ, ভাবল জ্যাসন। তার মনে হলো, আজকাল মানুষ যা শুরু করেছে, তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন পৃথিবীর বুক থেকে। নিশ্চয় তখনও কোন না কোন প্রাণী বেঁচে থাকবে। কারা? মানুষেরই কোন উন্নত সংস্করণ? নাকি সেই সরীসৃপ যুগের মত কিছু মাথামোটারা? নাকি খালি তেলাপোকা?

জোর করে উদ্ভট ভাবনাগুলো মন থেকে তাড়াল জ্যাসন। বাস্তবে ফিরে এল। সে এখন কোথায় রয়েছে, বিমান থেকে কতদূরে—জানে না। তার সঙ্গীসাথীরা কোথায়, কোন্‌দিকে গেল? বেঁচে আছে? নাকি বাঘের কবলে প্রাণ দিয়েছে? তা-ও জানে না। ফিরবে কি করে? জানোয়ারগুলো চলে গেলে নেমে ফেরার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণই নেই ওগুলোর। একটা দল সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেক দল এসে জায়গা করে নিচ্ছে সেখানে। তাড়াহুড়োয় কখন যেন কিসে লেগে ভেঙে গেছে জ্যাসনের ঘড়িটা। সূর্য এক জায়গায় স্থির। সময় কতখানি পেরোল, সেটাও বোঝার উপায় নেই। এমন বেকায়দা অবস্থায় আর কখনও পড়েনি সে।

খিদে মিটেছে বাঘগুলোর। একে একে উঠে চলে যাচ্ছে বনের ভেতরে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওগুলোর জায়গায় ঠাঁই করে নিচ্ছে—প্রাগৈতিহাসিক হায়েনা, বুনোকুকুর আর শেয়ালের দল। ওগুলোও কম হিংস্র নয়।

ওদিকে ছুঁচোর নাচন শুরু হয়ে গেছে জ্যাসনের পেটে। ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে খিদে। মাংসের অভাব নেই, কিন্তু তুলে আনতে হবে। সেটা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। অপেক্ষা করে রইল সে। আগে জানোয়ারগুলো খেয়েদেয়ে চলে যাক। তারপর নেমে হরিণ কিংবা ষাঁড়ের মাংস কেটে নিয়ে খাবে।

খেয়েদেয়ে একে একে চলে গেল জানোয়ারের দল। এরপর এল শবভোজী পাখির ঝাঁক। ওরাও হিংস্র, তবে মানুষকে এড়িয়ে চলে।

গাছ থেকে নামল জ্যাসন। কাছেই পড়ে থাকা একটা ষাঁড়ের মাংস কেটে নিয়ে আবার উঠল গাছে। শুকনো ডাল ভেঙে আগুন জ্বালল। পুড়িয়ে খেল মাংস। নামতে যাবে, এই সময় দেখল বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে শেয়াল-হায়েনার আরেকটা দল। নিশ্চয় অনেক দূরে কোথাও ছিল ওরা। রক্তের গন্ধ পেয়ে আসতে দেরি করে ফেলেছে। পাখিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর।

আবার কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে কে জানে! নামার সাহস পাচ্ছে না জ্যাসন। অগত্যা গাছের একটা তেডালায় আরাম করে হেলান দিয়ে বসল। অনেক পরিশ্রম গেছে। এই বেকায়দা অবস্থাতেও ঘুম এসে গেল তার। ঢুলতে থাকল তন্দ্রায়।

ঘুম ভাঙল ভীষণ তৃষ্ণায়। জ্যাসন দেখল, জানোয়ারগুলো চলে গেছে। একটা দুটো শকুন জাতীয় প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে ওখানে, হাড় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। সারা মাঠ জুড়ে শুধু হাড় আর হাড়, মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই। সব সাফ করে খেয়ে ফেলা হয়েছে। নিজের অজান্তেই,

শিউরে উঠল একবার সে। নামল গাছ থেকে।

এবার কোন্‌দিকে যাবে? যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেটা খুঁজে পেলেই ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু চিহ্ন রেখে আসেনি। জুতোর ছাপ মুছে গেছে জন্তু-জানোয়ারের পায়ের চাপে। মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্য। বুকে পিপাসা। পানি না পেলে বেশিক্ষণ হাঁটতেই পারবে না আর।

পানি অবশেষে পাওয়া গেল জঙ্গলের ভেতর। গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জ্যাসন। পিপাসা মিটল। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিল ঘাড়ে-মাথায়। তারপর উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল।

পথ হারিয়েছে জ্যাসন। অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল বনের ভেতর।

*

বেড়েই চলেছে উৎকণ্ঠা। যতই সময় যাচ্ছে বাড়ছে হতাশা, উত্তেজনা।

'প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা হলো গেছে ওরা,' বলল জুপনার। 'এখনও কোন খবর নেই। এত অসহায় বোধ করিনি জীবনে। কি করব বুঝতে পারছি না।'

ওয়াচ কেবিনে পায়চারি করছে জুপনার। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ডর্ফ আর হাইন্স।

'বিমান নিয়ে যে চক্কর দেব, সে ভরসাও পাচ্ছি না,' বলল ডর্ফ। 'দিক নির্ণয়ের উপায় নেই। কি মুশকিলেই যে পড়লাম!'

ওদের নিচে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে বাবুর্চি জোনস। নিষ্পাপ চোখের তারায় উদ্বেগ। এখনও ফিরছে না কেন সাহেবরা? এই নিয়ে কয়েকবার রেঁধেছে সে ওদের জন্যে। শেষে ফেলে দিতে হয়েছে। পকেট থেকে খরগোশের একটা শুকনো থাবা বের করে আলতো ভাবে মুখে বোলাল। বিড়বিড় করে বলল কি যেন।

ওপরের ওয়াচ কেবিনে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখছে এখন হাইন্স। পেলুসিডারের জন্তু-জানোয়ার আর গাছপালা বেশ কিছু চিনে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল হাইন্স। দূরবীনের আরও কাছে নিয়ে গেল চোখ।

'কি? দেখছ কিছু?' পেছন থেকে বলে উঠল জুপনার।

'একজন···মানুষ।···হ্যাঁ, মানুষ। কোন ভুল নেই।'

'দেখি দেখি! হাইন্সের হাত থেকে দূরবীনটা নিয়ে চোখে ঠেকাল জুপনার।'

'কোথায়? কোন্‌দিকে?'

'বাঁয়ে।'

'হুঁম্! আমাদের কেউ বলেই মনে হচ্ছে। হোর্স্ট কিংবা জ্যাসন।···টলছে! সাহায্য পাঠানো দরকার!'

তাড়াতাড়ি বিমান থেকে বেরিয়ে গেল দশজন সশস্ত্র লোক। দলপতি ডর্ফ। এগিয়ে আনতে গেল লোকটাকে।

একশো গজের মধ্যে আসার পর বোঝা গেল লোকটা জ্যাসন গ্রিডলে।

টলতে টলতে কাছে এসে দাঁড়াল সে। ভীষণ ক্লান্ত। যখন শুনল দলের আর কেউ ফিরে আসেনি, আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

'কতক্ষণ বাইরে ছিলাম, ডর্ফ?...আমার ঘড়িটা ভেঙে গেছে,' বলল জ্যাসন।

'বাহাত্তর ঘণ্টা।'

'ও, খুব বেশি না তাহলে। চেষ্টা করলে অন্যদের খোঁজ পাওয়া যেতেও পারে। আমার মনে হচ্ছিল, হপ্তাখানেকের বেশি কাটিয়ে এসেছি জঙ্গলে।'

বিমানে এসে দাড়ি কামাল জ্যাসন। গোসল করল। তারপর এসে বসল ডাইনিং রুমে। জোনসের তৈরি চমৎকার খাবার খেতে খেতে বলল, 'তোমার রান্নার টানেই বোধহয় বেঁচে ফিরেছি রবার্ট। শেষই হয়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে!'

'খাবারের জন্যে নয়, স্যার, অন্য কারণ আছে,' হেসে বলল জোনস। 'খরগোশের পা'কে সাহায্য করতে বলেছিলাম। ওটাই বাঁচিয়ে এনেছে আপনাকে।'

হেসে ফেলল জ্যাসন। 'একটারই এত ক্ষমতা? তাহলে আরও কিছু জোগাড় করে নিচ্ছ না কেন? অনেক খরগোশ আছে এখানে।'

'থাকলেও লাভ নেই। খরগোশের থাবা জোগাড় করতে হয় অমাবস্যার রাতে। এক কোপে কেটে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাতে ফুঁ দিতে হয়। এখানে না আছে রাত, না চাঁদ। অমাবস্যা পাব কোথায়?'

'ঠিকই তো, মস্ত সমস্যা।...দাও, আরেকটু মাংস দাও।'

খেতে খেতেই সঙ্গীদেরকে অভিযানের কথা সব শোনাল জ্যাসন।

'তারমানে,' বলল জুপনার, 'খোলা জায়গায় দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলে। ওই মাঠটা আবার চিনতে পারবে?'

'হয়তো পারব। কিন্তু আবার দলবল নিয়ে হেঁটে যাব?'

চুপ হয়ে গেল অফিসাররা। ভাবছে সবাই।

'এক কাজ করতে পারি,' ভেবে চলল জ্যাসন। 'বিমানে এখন মোট লোক আছি আমরা সাতাশজন। এটাকে চালানোর জন্যে বারোজনই যথেষ্ট। অন্য পনেরোজন বেরিয়ে পড়তে পারি। ডর্ফের নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে চোদ্দজনের দলটা। ক্যাপ্টেন, তুমি আর হাইন্স বিমানেই থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফিরে না এলে বুঝেশুনে যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে।'

'চোদ্দজন বলছ কেন? তুমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছ না?' জিজ্ঞেস করল জুপনার।

'ওদেরকে মোটামুটি পথ বাতলে দিয়ে আমি স্কাউট প্লেন নিয়ে যাব।'

'আপনি থাকুন,' বলে উঠল হাইন্স, 'দায়িত্বটা আমাকেই দিন। বাহাত্তর ঘণ্টা বনেবাদাড়ে ঘুরে মাত্র ফিরেছেন। এখনই আবার যাবেন?'

'তুমি গেলে লাভ হবে না। জায়গাটা চিনতে পারবে না। যেতে হবে আমাকেই। তবে, ডর্ফ প্রতিবাদ করলে তাকে প্লেনটা দিয়ে আমি হাঁটা দলের নেতা হতে পারি।'

'না না, দরকার নেই,' আপত্তি করল ডর্ফ। 'আমিই হেঁটে যাব। প্লেন নিয়ে গিয়ে জায়গা চিনব না, অযথা সময় নষ্ট করব আরও। আপনিই যান।'

'তাহলে প্লেনটা বের করো, প্লীজ,' বলল জ্যাসন। 'চেকআপ করে রাখো। আমি ঘুমিয়ে নিই কয়েক ঘণ্টা। চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, যান আপনি। প্লেন রেডি পাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ, আমার হয়তো ঘুম ভাঙবে না আপনা-আপনি। তিন চার ঘণ্টা পরে ডেকে দিয়ো। বেশি সময় নষ্ট করো না খামোকা। ডেকে দিয়ো কিন্তু।'

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে কেবিনে চলে গেল জ্যাসন।

*

ঘণ্টাচারেক পর তৈরি হয়ে ওয়াচ কেবিনে এসে ঢুকল জ্যাসন। হাতে একটা রাইফেল।

সাড়া পেয়ে জানালার কাছ থেকে ফিরে তাকাল জুপনার। 'এসে গেছ। ওদেরকে দেখলে প্লেন নামাবে নাকি?'

'যদি নামানোর জায়গা পাই,' বলল জ্যাসন। 'রাইফেল নিয়েছি দেখে বলছ তো? দরকার আছে এটার। রাইফেল ছাড়া এই পেলুসিডারের কোথাও আর এক পা বাড়াচ্ছি না আমি।'

বিমান থেকে বেরিয়ে এল জ্যাসন। জুপনারও বেরোল তার পিছু পিছু।

স্কাউট প্লেনের কাছে অপেক্ষা করছে হাইন্স ডর্ফ আর তার দল।

আফিসারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্লেনে উঠল জ্যাসন। ককপিটের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করে বলল, 'যাই।'

'এসো, গুডবাই,' বিষণ্ণ জুপনার হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে। 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

প্লেন নিয়ে আকাশে উঠল জ্যাসন।

দু'টো ঘণ্টা একনাগাড়ে উড়ল। যেখানেই খোলা প্রান্তর চোখে পড়ল, উড়ে গেল। কিন্তু হোর্স্ট কিংবা তার দলের চিহ্নও দেখল না। বন যেখানে পাতলা, সেদিকেও গেল বারকয়েক। কিন্তু বৃথা। দেখা গেল না ওদেরকে।

উড়তে উড়তে একটা পাহাড়ের ওপরে চলে এল জ্যাসন।

হঠাৎ ছায়া পড়ল মাথার ওপরে। মেঘ! পেলুসিডারে মেঘ! মুখ তুলে চেয়েই চমকে উঠল সে। বিশাল এক বাদুড় যেন! ছড়ানো ডানার দৈর্ঘ্য পঁচিশ ফুটের কম হবে না। লম্বা, চোখা ঠোঁট, ফাঁক হয়ে আছে সামান্য। ভেতরে সারি সারি ধারাল তীক্ষ্ণ দাঁত। নিচে নামছে প্রাগৈতিহাসিক টেরানোডন।

বুঝতে পারল জ্যাসন, বিমান আক্রমণ করতে এসেছে পাখিটা। তাড়াতাড়ি গতি বাড়িয়ে দিল সে। কোণাকোণি উঠে এল তিন হাজার ফুট ওপরে। বিশাল পাখিটাও তীব্র গতিতে ছুটে আসছে পেছন পেছন। আবার গোত্তা দিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল বিমান। পাখিটাও আসছে। নাছোড়বান্দা! নিজের মত আরেকটা প্রাণী ভাবছে না তো আকাশযানটাকে?

কাছে এসে গেল পাখি। এদিক ওদিক বাউলি কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে জ্যাসন। এত অত্যাচার সইতে খুব কষ্ট হচ্ছে, আপত্তি জানাতে শুরু করেছে এঞ্জিন। ওটার প্রচণ্ড গোঁ গোঁ শব্দে কান ঝালাপালা। সেই শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল পাখিটার তীক্ষ্ণ চিৎকার। বিমানের একেবারে কাছে চলে এসেছে। আক্রমণ করে বসবে যে কোন মুহূর্তে।

হঠাৎ ডাইভ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জ্যাসন। কিন্তু হিসেবে ভুল করে ফেলল। বিমানের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানব পাখি। ভয়ানক সংঘর্ষ! কাঠ আর ধাতুর পাত ভাঙার শব্দ। ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল আকাশযান।

প্যারাস্যুটের দিকে হাত বাড়িয়েছে জ্যাসন, খুলে আনল ব্র্যাকেট থেকে। দ্রুত হাতে বেঁধে ফেলল পিঠে। পরক্ষণেই ঝাঁপ দিল শূন্যে। মাথায় কিসের আঘাত লাগল। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি অনুভব করল সে।

ছয়

'তোমার লোকেরা কোথায়?' টারগাস জিজ্ঞেস করল আবার।

মাথা নাড়ল টারজান, 'জানি না!'

'দেশ কোথায় তোমার?'

'পেলুসিডারে নয়। এখান থেকে অনেক দূরে।'

টারগাসের কাছে এটা নতুন কথা। অবাক হলো সে। পেলুসিডার ছাড়া আর কোন দেশ আছে বলে জানা নেই তার। আরেকটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগল তার কাছে। দলের লোক কোথায় আছে টারজান জানে না। পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে না! এটা কেমন কথা? একমাত্র সাগরে ছাড়া টারগাসকে আর যেখানে খুশি ছেড়ে দেয়া হোক, ঠিক তার দেশে ফিরে আসতে পারবে।

'তোমার মত গিলাকরা কোথায় থাকে আমি জানি,' টারগাস বলল। 'হয়তো ওরাই তোমার লোক। নিয়ে যেতে পারব। যাবে?'

ভাবল একটু টারজান, তারপর বলল, 'কবে দেখেছ ওই গিলাকদেরকে? কতদিন ধরে আছে ওরা পেলুসিডারে?'

কবে, কতদিন, শব্দগুলো একেবারেই অচেনা টারগাসের কাছে। পেলুসিডারে সময়ের কোন পরিমাপ নেই। কিছু বলতে পারল না সে।

আর কোন প্রশ্ন করে লাভ নেই, বুঝল টারজান। নিজের চোখেই দেখতে হবে। টারগাসকে পথ দেখাতে বলল।

দুই অসম জীবের মাঝে বন্ধুত্ব! একজন লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার জীব, মানুষের পূর্বপুরুষ, আরেকজন আধুনিক মানুষ। চেহারা চালচলন সবই ভিন্ন। অথচ মনের মিল হয়ে গেছে!

এগিয়ে চলেছে ওরা। সময় যায়। খিদে পেলে দু'জনে মিলে শিকার করে একসঙ্গে বসে খায়। তৃষ্ণা পেলে পানি খায় ঝর্না থেকে। পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করে। একজন যখন ঘুমোয়, আরেকজন জেগে বসে পাহারা দেয়।

ধীরে ধীরে গিলাকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে টারগাসের। টারজানও ভালবাসতে শুরু করেছে কুৎসিত ভয়ানক সাগোটটাকে।

চলার প্রথম দিকে প্রচুর কথা বলেছে দু'জনে। একে অন্যের সম্পর্কে যতটা পারা যায় জেনে নিয়েছে। আস্তে আস্তে জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে কথা কমে গেছে ওদের। গম্ভীর, মৌন হয়ে গেছে। নিতান্ত দরকার না পড়লে মুখই খোলে না। টারজান একটু বেশি গম্ভীর। তার মনে ভাবনা, কি করে ও-২২০তে ফিরবে!

চলতে চলতে বন পেরিয়ে এল ওরা। সামনে সবুজ তৃণভূমি। ওপাশ থেকে আবার শুরু হয়েছে জঙ্গল। পাহাড়ের রেখা চোখে পড়ছে বনের মাথায়।

কিছুক্ষণ থেকেই মৃদু একটা শব্দ কানে আসছে টারজানের।

হঠাৎ বেড়ে গেল শব্দটা। জোরাল হলো।

খপ করে টারজানের হাত চেপে ধরল টারগাস। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'জলদি পালাও! বনের দিকে ছোটো! টিপডার!'

কিছু না বুঝেই টারগাসের সঙ্গে দৌড় দিল টারজান। বনের ভেতরে ঢুকল আবার। ফিরে তাকাল। প্রান্তরের ওপাশে বনের মাথায় উড়ছে একটা কিছু। অনেক দূরে রয়েছে, তাই ছোট লাগছে।

'টিপডার!' ফিসফিস করে বলল টারগাস। বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ।

'টিপডার কি?' টারজান জানতে চাইল।

'টিপডার, টিপডার!' এর বেশি আর বোঝাতে পারল না টারগাস।

'টিপডার কি কোন প্রাণী? জিজ্ঞেস করল টারজান।

'হ্যাঁ। ভয়ানক হিংস্র। ভীষণ শক্তি গায়ে।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে টারজান। আরও এগিয়ে এসেছে জিনিসটা। 'ওটা টিপডার নয়।'

'তাহলে কি?'

'এ্যারোপ্লেন।'

'সে আবার কোন জীব?'

'জীব নয়,' বলল টারজান। 'তোমাকে বোঝানো শক্ত। ওটা এক ধরনের যন্ত্র। আকাশে ওড়ার জন্যে বানিয়েছে আমার দেশের মানুষ।'

মাথার ওপর প্রায় এসে পড়েছে প্লেন। ভয় মোটেই গেল না টারগাসের। টারজানের বাহু খামচে ধরে টান দিয়ে বলল, 'জলদি গাছের আড়ালে চলো। নইলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে।'

বনের গভীরে না গিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল টারজান। নিশ্চয় ও-২২০র স্কাউট প্লেন, তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। পাইলটের চোখে পড়ার জন্যে লাফালাফি শুরু করে দিল সে। হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল। মাথার ওপর

দিয়ে চলে গেল বিমান। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে। নিশ্চয় পাইলট তাকে দেখতে পায়নি। হতাশ চোখে চেয়ে রইল টারজান সেদিকে।

মিলিয়ে গেল বিমানের শব্দ। কিছুই ঘটল না দেখে সাহস করে বেরিয়ে এল টারগাস। টিপডারের চেয়েও সাংঘাতিক জীব। কি রকম গর্জাচ্ছিল!

জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল টারজান। কান খাড়া। বিমানটার আবার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে।

কিন্তু আর ফিরল না বিমান।

আবার চলল দু'জনে। সামনে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির চেহারা। পাহাড়ী উপত্যকায় এসে পৌঁছল ওরা। গাছপালা প্রায় নেই। মাঝে মাঝে গিরিখাত। তলায় বড় বড় পাথর। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে গুহামুখ। অজস্র ফাটল। পানি আর শিকার পাওয়া কঠিন হবে এখানে, টারজান বুঝল।

এগিয়েই চলল ওরা। হঠাৎ কানে এল তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা ডাক। পেঁচার ডাকের মত, তবে অনেক বেশি জোরাল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে টারগাস। ফিসফিস করে বলল, 'ডিয়াল! রেগে গেছে!'

'ডিয়াল কি?' জানতে চাইল টারজান।

'অনেক বড় পাখি। খুব বদমেজাজী । তবে মাংস চমৎকার। তা ছাড়া আমার খিদেও পেয়েছে।'

যত ভয়ঙ্কর প্রাণীই হোক, মাংস ভাল আর টারগাসের খিদে পেয়েছে, সুতরাং যেতেই হবে। পাখিটাকে মারার চেষ্টা করতে হবে।

আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর উটপাখির গন্ধটা টারজানের নাকে এল। পা টিপে টিপে একটা বড় পাথরের আড়ালে এসে দাঁড়াল টারগাসের সঙ্গে। উঁকি দিয়েই চমকে উঠল টারজান। বিরাট এক পাখি। উটপাখি আর মোরগের মিশ্রণ। মাটি থেকে আট-নয় ফুট ওপরে মাথা—ঘোড়ার মাথার চেয়ে বড়। বাঁকানো মস্ত ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, কিছু একটাকে ঠোকর মারছে যেন। পায়ে বড় বড় নখ, তিনটে করে। আধুনিক উটপাখির পূর্বপুরুষ—মাইওসিন যুগের ফোরারাকোস। বইয়ে ওই প্রাগৈতিহাসিক পাখিরও ছবি দেখেছে টারজান।

পাহাড়ের বড় একটা ফাটলে ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে পাখিটা। গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বল্লমের ফলা। খোঁচা লাগল ফোরোরাকোসের গলায়। রাগে চেঁচিয়ে উঠল পাখিটা।

হাতের মুগুর শক্ত করে চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল টারগাস। এটা দিয়ে এতবড় জীবকে কি করে মারবে—অবাক হলো টারজান। বাধা দেয়ার সময় নেই। এগিয়ে গেছে সাগোট। অগত্যা পিছু নিতে হলো তাকেও।

শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়েছে পাখিটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

আঘাত হানতে তৈরি হচ্ছে টারগাস। মাথার ওপরে তুলে নিয়েছে মুগুর। ও কি করতে চলেছে বুঝে ফেলল টারজান। কিন্তু এটা কি সম্ভব? যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়? ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।

মুগুর ছুঁড়ে মারল টারগাস পাখির পা লক্ষ্য করে। পা ভেঙে দিয়ে কাবু করে ফেলার ইচ্ছে।

টারজান যা ভয় করেছে, তাই হলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো মুগুর। তাড়াতাড়ি তীর-ধনুক তুলল সে।

চেঁচিয়ে উঠে আক্রমণ করতে ছুটে এল পাখি। পর পর দুটো তীর বুকে বিঁধতেই টলে উঠল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। তবু গলা লম্বা করে ঠোকর মারতে এল টারগাসকে। আরেকটা তীর বিঁধল গলায়। এক মুহূর্ত দেরি করিয়ে দিতে পেরেছে টারজান, ব্যর্থ হলো ডিয়ালের ঠোকর। সরে গেছে টারগাস। তাকে না পেয়ে টারজানকে লক্ষ্য করেই ঠোকর মারল ওটা। সাঁ করে একপাশে সরে গেল টারজান, গায়ে লাগল না ঠোকর। আবার ঠোঁট তুলল ডিয়াল। কিন্তু নামিয়ে আনার আগেই অন্যপাশ থেকে ছুটে এল একটা বল্লম। এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল কণ্ঠনালী। উট যেভাবে শোয়, তেমনি ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ডিয়াল। লম্বা হয়ে গলাটা পড়ল পাথরের ওপর। কয়েকবার খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল দেহ। ফাঁক হওয়া ঠোঁট দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছে টাটকা রক্ত।

বল্লম ছুঁড়ল কে? ফিরে তাকাল টারজান। ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন মানুষ। টারজানের প্রায় সমান লম্বা। সুন্দর স্বাস্থ্য। ব্রোঞ্জ-রঙ চামড়া। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, রেড ইন্ডিয়ানদের মত করে হরিণের চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা। কোমরে কৌপীন, চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো। তাতে পাথরের ছুরি গোঁজা। উজ্জ্বল কালো দুই চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। নব পাথর-যুগের মানুষ নয় তো!

মাটি থেকে মুগুর তুলে নিয়েছে টারগাস। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে মানুষটার দিকে। আক্রমণের ভঙ্গি।

টান দিয়ে ছুরি খুলে নিল মানুষটা। সে-ও আঘাত হানতে তৈরি।

'আমি টারগাস। তোকে খুন করব!' শাসাল সাগোট।

এক লাফে দু'জনের মাঝে চলে এল টারজান। 'কেন, মারবে কেন?'

'ও গিলাক, তাই।'

'গিলাক হলেই মারতে হবে!' টারগাসকে বোঝাল টারজান, গিলাকটা বল্লম ছুঁড়ে না মারলে তাদের দু'জনকে মরতে হত। যে প্রাণ বাঁচিয়েছে তাকে কি মারা উচিত।

'আমি না মারলে ও আমাকে মারবে,' সহজ সরল বক্তব্য।

'না, মারবে না,' মানুষটার দিকে ফিরল বনের রাজা। বন মানুষের ভাষায় বলল, 'আমি টারজান। ও টারগাস।'

'আমি টোয়ার,' জবাব দিল আগন্তুক। ভাষাটা বনমানুষের ভাষার মতই।

'বেশ আমরা তাহলে বন্ধু। কোন শত্রুতা নেই।'

হতভম্ব হয়ে গেল টোয়ার। বলে কি লোকটা?

'সাগোটদের ভাষা জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

'অল্প অল্প।...কিন্তু বন্ধু হতে যাব কেন আমরা?' টোয়ার অবাক।

'শত্রুতাই বা করব কেন?'

'তা-তো জানি না! বরাবর তাই করে এসেছি।'

'এটা কোন কথা হলো না। তিনজনে মিলে ডিয়ালটাকে মেরেছি। আমরা দু'জন না এলে ওটা তোমায় মেরে ফেলত। আর তুমি না থাকলে আমরা মরতাম। তার মানে একে অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছি আমরা। বন্ধু হওয়াই যায়। টারগাস, কি বলো?'

চুপ করে এক মুহূর্ত টারজানের দিকে চেয়ে রইল টারগাস। কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল মৃত পাখিটার দিকে।

টোয়ার আর টারজানও এগোল। তিনজনে মিলে কাটল পাখিটাকে, আগুন জ্বেলে মাংস পুড়িয়ে খেল।

ছুরি কোমরে গুঁজে বল্লম হাতে উঠে দাঁড়াল টোয়ার। পা বাড়াতেই টারজান জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

একদিকে হাত তুলে বলল টোয়ার। 'আমার গাঁয়ে।'

'আমরাও ওদিকে যাব,' বলল টারজান। 'চলো এক সঙ্গেই যাই। যা দেশ, দল ভারী থাকা ভাল।'

আবার শুরু হলো চলা।

নিচু একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ল ওরা। দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আরেকটা পাহাড়শ্রেণী।

আঙুল তুলে বড় পাহাড়ের চূড়াটা দেখিয়ে বলল টোয়ার, 'ওখানেই রয়েছে জোরাম।'

'জোরাম! সেটা আবার কি?' জানতে চাইল টারজান।

'আমার গাঁ। টিপডার পাহাড়ে।'

আবার টিপডার নামটা শুনল টারজান। 'টিপডার কি?'

অবাক চোখে তাকাল টোয়ার। 'কোথাকার জীব হে তুমি? টিপডার কি জানো না!'

'পেলুসিডারের মানুষ নই আমি!'

'নও!' টোয়ার আরও অবাক। 'তাহলে কোথাকার! আগুন সমুদ্রের ওপরে ভেসে আছে আরেকটা দেশ, মোলম এজ—ওখানকার লোক নাকি? কিন্তু ওখানে তো বেঁটে দৈত্যরা ছাড়া আর কেউ থাকে না!'

কোথায় ওর দেশ, বলে বোঝাতে পারবে কিনা টোয়ারকে, যথেষ্ট সন্দেহ আছে টারজানের। ওসব নিয়ে আর আলোচনা করল না।

নীরবে পথ চলেছে তিনজনে। পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়ছে ওদের। তিন যুগের তিনজন মানুষ। অগ্রগতির তিনটি ধাপ লক্ষ বছরের ওপার হতে এসে যেন মিলিত হয়েছে। মেনেও নিয়েছে একে অন্যকে।

চলতে চলতে একদিন বিশাল এক পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। উঠতে লাগল গা বেয়ে।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা সমতল জায়গায় চকচকে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখল টারজান। কি ওটা? কেমন যেন চেনা চেনা। অজানা অচেনার

প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তার চিরদিনই। জিনিসটার দিকে এগোল সে।

জিনিসটা ভাঙাচোরা এ্যারোপ্লেন। ও-২২০র স্কাউট প্লেন। চিনতে অসুবিধা হলো না টারজানের।

সাত

ছুটতে ছুটতে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে জেনা। এখন আর দেখা যাচ্ছে না লোকগুলোকে। চারজন শয়তান ফেলি যোদ্ধা—সেই কখন থেকে অনুসরণ করে আসছে তাকে। নিচে তাকাল সে। চোখে পড়ছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

খুব খিদে পেয়েছে জেনার। ক্লান্তও হয়ে পড়েছে খুব। গলার ভেতরটা শুকিয়ে এসেছে। আর পারছে না! একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল সে। উঁকি দিয়ে রইল একপাশ থেকে। ওরা আসছে কিনা দেখছে। এই টিপডার পাহাড়ের জন্ম তার, এখানেই বড় হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ঘৃণা করে এসেছে নিচু অঞ্চলের ফেলিদের। মরবে, তবু ওই শয়তানদের হাতে ধরা দেবে না সে।

জোরামের মানুষেরা খুব সুন্দর, মেয়েরা আরও বেশি। ওদের মাঝে জেনার রূপের খ্যাতি আছে। একথা কানে গেছে ফেলিদেরও। প্রায়ই জোরামে হামলা চালিয়ে কিংবা চুরি করে ওখানকার মেয়েদেরকে নিয়ে যায় ওরা। একটা মেয়েকে ধরে নিতে যদি কয়েকশো যোদ্ধাকে প্রাণ দিতে হয়, তা-ও সই। পিছপা হবে না ফেলি যোদ্ধারা। আর জেনার মত সুন্দরীর জন্যে দেশসুদ্ধ সব পুরুষ প্রাণ দিতে রাজি আছে।

জেনার এক বোন লেনাকে আগেই চুরি করে নিয়ে গেছে ফেলিরা। এবাব এসেছে তাকে নিতে। তক্কে তক্কে ছিল ওরা। এইবার পেয়েছে সুযোগ। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না।

অপেক্ষা করে আছে জেনা। হঠাৎ দেখতে পেল লোকগুলোকে। অতি সন্তর্পণে উঠে আসছে নিঃশব্দে। আর থাকা যায় না এখানে। ধরা পড়ে যাবে। একটা পাথর হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। জোরে পাথরটা ছুঁড়ে মারল রোমশ লোকগুলোর দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'দূর হয়ে যা জলার পোকারা! জোরামের লাল ফুলকে পাবি না তোরা কিছুতেই।'

ছুটল আবার জেনা। পেছনে তাড়া করল চার ফেলি।

বিশাল এক ফাটলের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল জেনা। হাঁ করে আছে বিশাল পাহাড়ী খাদ, তলা দেখা যায় না, অন্ধকার। এটা পেরোনো যাবে না। মোড় নিয়ে এক পাশ ধরে ছুটল আবার সে। পা পিছলে খাদে পড়ে মরার ভয় আছে, কিন্তু গ্রাহ্যই করল না জোরামের লাল ফুল। ছুটছে। অনন্ত সূর্যের

লালচে আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে। কেমন অদ্ভুতও লাগছে। হরিণের চামড়া দিয়ে লজ্জা ঢেকেছে কোনমতে। সোনালি চুলের গোছা কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে এসেছে পিঠে। গলায়, হাতে, কোমরে পাখির হাড় আর পালকের বিচিত্র গহনা। কোমরে চামড়ার ফালিতে আটকানো একটা পাথরের ছুরি। হাতে ছোট আকারের হালকা বল্লম, ফলাটা পাথরে তৈরি।

আবার থমকে দাঁড়াতে হলো জেনাকে। সামনে ফাটল, দু'পাশে খাদ। পেছনে তাড়া করে আসছে দুশমন। আর পালানোর পথ নেই। এবার কি করবে? খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে না জেনা। এত সহজে হাল ছাড়বে না পাহাড়ী মেয়ে। অসম্ভবের পথেই চেষ্টা করবে। চামড়ার ফালি দিয়ে বল্লমটাকে কায়দা করে ঝুলিয়ে দিল গলা থেকে, পিঠের ওপর। পেছনে আরেকবার চেয়েই পা দিল খাদে। খাড়া দেয়ালের খাঁজ ধরে ধরে নেমে চলল। যে কোন মুহূর্তে হাত কিংবা পা ফসকাতে পারে। তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু।

অতি ধীরে ধীরে নামছে জেনা। ওপরের দিকে তাকাচ্ছে বার বার। ফেলিদের দেখা নেই। ওরা কি হারিয়ে ফেলল তাকে? নাকি ফিরে গেল? না অন্য ফন্দি করল? ভাবছে, কিন্তু থামল না সে। নেমেই চলল।

অনেকখানি নেমে একটা জায়গায় এসে থামল জেনা। ওপরের চেয়ে ঢালু এখানে পাহাড়ের গা। ইচ্ছে করলে পাশে সরে যাওয়া যায়। বেরিয়ে যাওয়া যায় ফাটল থেকে। অহেতুক তলায় নামার দরকার কি? আরেকবার ওপরের দিকে তাকাল সে। নেই ফেলিরা। কি হলো ওদের? টিপডারে আক্রমণ করল?

পাশে সরতে লাগল জেনা। অস্বস্তি বোধ করছে। গেল কোথায় শয়তানগুলো?

একপাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জেনা, পাহাড়ের ঢালে।

নিচে সবুজ উপত্যকা। চোখ জুড়ানো মাঠ। নানা রকম প্রাণী চরছে। ফেলিদের ছায়াও চোখে পড়ছে না। নিশ্চয় হতাশ হয়ে ফিরে গেছে ওরা। আবার একদিন আসবে। গাঁয়ের কাছে লুকিয়ে থাকবে সুযোগের অপেক্ষায়।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা মৃদু গুঞ্জন কাছে আসছে জেনার। ধীরে ধীরে বাড়ছে এখন। কেমন যেন চেনা চেনা। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। এগিয়ে আসছে বিশাল পাখি। টিপডারই হবে! এসে গেল ওটা। জেনা লুকিয়ে পড়ার আগেই উড়ে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ফিরে এল খানিক পরেই। ততক্ষণে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে সে। এবার আর একটা টিপডার নয়, দুটো। বড়টার ওপরে আরেকটা। বোধহয় লড়াই বাঁধবে।

যা ভেবেছে জেনা আক্রমণ করে বসল টিপডার, ছোটটা বড়টাকে। পাক খেয়ে খেয়ে নিচে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড শব্দ। কি যেন ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ। পরক্ষণেই অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটতে দেখল জেনার। বড় টিপডারের সামনের দিকে ছোট একটা গর্ত হয়ে গেল। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল অদ্ভুত এক জিনিস। কালো গোল একটা বিশাল ব্যাঙের ছাতার মত।

তলায় ঝুলছে মানুষের মত কিছু। দুলছে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ছোট টিপডারটার অবস্থা টলমল। শাঁ করে খানিকটা উড়ে গিয়েই ঝরা পাতার মত ঝড়ে পড়ল যেন দূরের মাঠে। আর উঠল না। বড় টিপডারটার নাক নিচু হয়ে গেল সামনের দিকে। সোজা ছুটে গিয়ে ধাক্কা খেল পাহাড়ের গায়ে। ভয়ানক শব্দ। ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে গিয়ে পড়ে রইল ওটা। নড়াচড়া নেই আর।

নেমে এল ছাতার মত জিনিসটা, তলায় ঝুলছে একজন মানুষ।

ভয়ানক টিপডারের পেট থেকে মানুষ বেরিয়েছে! এমন কাণ্ড দেখা তো দূরের কথা, শোনেওনি কখনও জেনা। আঁতকে উঠে পেছন ফিরেই দৌড় দিল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে চায়। পড়িমরি করে নামতে লাগল পাহাড়ের নিচে।

খানিকটা নেমেই চমকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল জেনাকে। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই চারজন ফেলি। তার আগেই এসে বসে আছে পাহাড়ের গোড়ায়। লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল—এখন ধরতে আসছে।

একপাশে মোড় নিয়ে ছুটল জেনা। কিন্তু সেদিকেও বিপদ। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই চোখে পড়ল জানোয়ারগুলোকে। ভয়াবহ একদল নেকড়ে-কুকুর। আর রক্ষা নেই, বুঝে গেল সে। তবু হাল ছাড়ল না জেনা। আরেক পাশে ঘুরে দৌড় দিল। সোজা গিয়ে পড়ল সেই মানুষের গায়ে, যে বেরিয়ে এসেছে টিপডারের পেট থেকে।

চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল জেনা। মানুষটার আচরণে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হাঁ করে চেয়ে রইল সে আগন্তুকের দিকে।

পেছনে তীক্ষ্ণ হিংস্র চিৎকার, একপাশে ফেলিদের হৈ-চৈ, সামনে আজব মানুষ। কি করবে, ঠিক করতে পারছে না জেনা। হঠাৎই নিয়ে ফেলল সিদ্ধান্ত। একটানে পিঠ থেকে খুলে আনল বল্লম। যে শত্রু আগে আক্রমণ করবে, তাকেই মারবে।

জ্যাসনও কম অবাক হয়নি। সে-ও হাঁ করে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ওদিকে কাছে এসে পড়ল নেকড়ে-কুকুরের দল। আর এগোতে দেয়া ঠিক নয়। টান দিয়ে হোলস্টার থেকে রিভলভার খুলে আনল সে। নেকড়ের দলকে নিশানা করে টিপে দিল ট্রিগার।

রিভলভারের গর্জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নেকড়েগুলো, দাঁড়িয়ে পড়ল ফেলিরাও। এমন অদ্ভুত আওয়াজ জীবনে শোনেনি ওরা। জেনার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে। বোকার মত চেয়ে আছে রিভলভারের মুখ থেকে বেরোনো ধোঁয়ার দিকে।

খপ করে জেনার হাত চেপে ধরল জ্যাসন, দৌড় দিল এক দিকে। জারামের মানুষ ছাড়া আর সব মানুষই জেনার শত্রু। তাই মানুষটাকে মারার জন্যে বল্লম উঁচিয়ে ধরল সে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না জ্যাসন। পেছনে আবার ছুটে আসছে নেকড়ের পাল। মেয়েটাকে নিয়ে ওগুলোর কাছ থেকে সরে যেতে হবে যে করেই হোক।

পেছনে আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল জ্যাসন। বল্লম নামিয়ে নিয়ে জেনাও

তাকাল। সে বুঝে গেছে, আপাতত তার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই মানুষটার, বিপদের জায়গা থেকে পালাতে চাইছে তাকে নিয়ে। দু'জনেই দেখল, ফেলিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদল নেকড়ে। আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ফেলিরা। তবে আরেকদল নেকড়ে ছুটে আসছে তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে।

জেনাকে নিয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠে গেল জ্যাসন। একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল। পৌঁছে গেছে নেকড়েগুলো, দশ-বারোটার কম নয়। গুলি চালাল সে সামনের জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওটা। আবার গুলি চালাল জ্যাসন, আবার, আবার। এক এক করে লুটিয়ে পড়ছে, কিন্তু তবু থামছে না নেকড়েগুলো। গুলির আওয়াজে থমকে যাচ্ছে না আর প্রথম বারের মত।

ফেলিরাও তুমুল লড়াই করে যাচ্ছে। বল্লমের খোঁচায় মরছে একের পর এক নেকড়ে। শেষে পিঠটান দিতে হলো ওগুলোকে। গোটা দশেক মরেছে, বাকিগুলো পিছিয়ে গেল।

ফেলিরা চোখ ফেরাল এবার জেনা আর জ্যাসনের দিকে। চেঁচিয়ে কিছু বলল রোমশ সর্দার। বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে এল। তার পেছনে তিন সঙ্গী।

রিভলভার উঁচিয়ে ধরে রেখেছে জ্যাসন। কিন্তু মানুষ খুন করতে বাধছে। ফাঁকা আওয়াজ করল।

থামল না ফেলিরা। এগিয়েই আসছে। আর মাত্র কয়েক গজ।

দ্বিধা করছে জ্যাসন। বুঝতে পারছে, আর দেরি করলে মরতে হবে তাকে। রিভলভার নিশানা করল সর্দারের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।

দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল যেন সর্দার। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। দু'চোখে অবিশ্বাস। টলে উঠল। পরক্ষণেই দড়াম করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

এক মুহূর্তে সর্দারের দিকে চেয়ে রইল তিন ফেলি। তারপর আবার ছুটে এল।

আবার গুলি করল জ্যাসন।

পড়ে গেল আরেক ফেলি।

আর এগোনোর সাহস করল না ফেলিরা। ঘুরে দৌড় দিল একজন। অন্যজন অনুসরণ করল তাকে। ছুটে চলে গেল পাহাড়ের নিচের দিকে।

পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জেনা। চোখ বড় বড় করে দেখছে আজব মানুষটাকে। মুগ্ধ দৃষ্টি। ইচ্ছে করলে ছুটে পালাতে পারে এখন। কিন্তু এক অজানা আকর্ষণ পা আটকে দিয়েছে যেন তার। চেয়ে চেয়ে দেখছে সে মানুষটাকে।

পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসছে নেকড়েরা। সতর্ক চোখে দেখছে জ্যাসন আর জেনাকে। আক্রমণের ইচ্ছে আর নেই। পড়ে থাকা সঙ্গীদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষেরা কিছু করছে না দেখে সাহস ফিরে পেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল লাশগুলোর ওপর। খেতে শুরু করল ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

আট

অবাক হয়ে ভাঙা বিমানটা দেখছে টোয়ার আর টারগাস।

প্লেনের ভেতর পাইলটের লাশ খুঁজছে টারজান। পেল না। গেল কোথায়? প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে? কে এসেছিল? জুপনার? জ্যাসন? না ডর্ফ?

চিহ্ন খুঁজতে শুরু করল টারজান। শিগগিরই পেয়ে গেল জুতোর ছাপ। কার জুতো! বাতাসে নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকতে লাগল। নিশ্চয় অনেকক্ষণ আগে গেছে এখান থেকে। গন্ধটা আর তত জোরাল নয়। তবে চিনতে পারল। জ্যাসন গ্রিডলে।

ছাপ ধরে ধরে প্রায় পুরো এলাকাটা খুঁজল তিনজনে। অনেকগুলো নেকড়ে-কুকুরের ছিন্নভিন্ন চামড়া আর ভাঙা হাড়গোড় দেখল। দুটো মানুষের কঙ্কালও দেখা গেল। আরও কিছু পায়ের ছাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আশেপাশে। বড় একটা পাথরের গোড়ায় দেখা গেল দু'জোড়া ছাপ। একটা জ্যাসনের জুতোর, অন্যটা?

টোয়ার আর টারগাসকে ডাকল টারজান। ওরা কাছে এসে দাঁড়ালে আঙুল তুলে দেখাল ছাপগুলো। বলল, 'একটা আমার বন্ধুর...'

'তোমার বন্ধুর!' অবাক হয়ে গেছে টোয়ার।

'হ্যাঁ। ওই প্লেনের ভেতর ছিল।'

'ওটা তো টিপডার!'

'যা-ই হোক, ওটার ভেতরেই ছিল। বেরিয়েও এসেছিল। তারপর নিশ্চয় নেকড়েরা তাড়া করেছিল। এসে ছিল এই পাথরের ওপর।...কিন্তু আরেক জোড়া ছাপ রয়েছে এখানে। কার?'

ছাপগুলো একবার পরীক্ষা করেই উত্তেজিত হয়ে উঠল টোয়ার। 'আরে! জেনা! জোরামের লাল ফুল!'

'জেনা! লাল ফুল!' কিছুই বুঝতে পারছে না টারজান।

'জেনা, আমার বোন। ও খুব সুন্দরী। তাই জোরামের লোকে তার নাম দিয়েছে লাল ফুল। তোমার বন্ধু আমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে!'

'আমার মনে হয় না!' আঙুল তুলে পড়ে থাকা কঙ্কাল দুটো দেখাল টারজান। 'নেকড়েরা খেয়ে ফেলেছে হয়তো!'

পায়ে পায়ে এগোল টোয়ার। ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দুটো কঙ্কাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, তোমার বন্ধুর নয়, জেনারও নয়। ও দুটো ফেলি।'

'ফেলি! সে আবার কি? কি করে বুঝলে?'

'ওরা নিচু অঞ্চলের মানুষ। জোরামের নিচে, টিপডার পাহাড়ের গোড়ায়

ওদের বাস। আমাদের শত্রু জালকেরা ধরে খেয়েছে।...কি করে বুঝলাম? ওই যে দেখো, দুই জোড়া স্যান্ডেল। তলাটা কাঠের। জলা অঞ্চলে বাস করে, তাই কাঠের তলা লাগাতে হয়। আমরা থাকি শুকনোয়, চামড়ার তলা লাগালেই চলে। জুতোর ছাপ দেখেই বুঝতে পেরেছি, তোমার বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে আমার বোন জেনা।'

'হুঁ! তাহলে তুমি বলছ, কঙ্কাল দুটো জ্যাসন কিংবা জেনার নয়?'

'না, মাথা নাড়ল টোয়ার।'

'কিন্তু তোমার বোন দেশ ছেড়ে এত দূরে এল কেন?'

'ফেলিরা তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ পেলেই জোরামের মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যায়। নিশ্চয় জেনার জন্যে এসেছিল ওরা। সুযোগ বুঝে তাড়া করেছিল। জেনা ছুটে এসেছিল এদিকে। এই সময় আক্রমণ করে জালকগুলো। বোধহয় তখন তোমার বন্ধু সাহায্য করেছিল, শেষে নিজেই ধরে নিয়ে গেছে আমার বোনকে।'

টারজান হাসল। 'দু'জোড়া পায়ের ছাপ পাশাপাশি গেছে। দেখে কি মনে হয়? জোরজবরদস্তি করা হয়েছে?'

মাথা চুলকাল টোয়ার। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না! আশ্চর্য! জেনা তো জোরামের কেউ ছাড়া আর কারও সঙ্গে যাওয়ার মেয়ে নয়!'

'আমার বন্ধুও কোন মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার লোক নয়,' বলল টারজান। 'হয়তো জেনাকে জোরামে পৌঁছে দিতে গেছে।'

'গেলে ভালই। কিন্তু যদি জেনার কোন ক্ষতি করে, খুন করব তাকে আমি।'

'চলো, এগোই,' বলল টারজান।

আবার এগিয়ে চলল তিনজনে—টারজান, টোয়ার আর টারগাস।

*

কামড়া-কামড়ি খামচা-খামচি করছে নেকড়েগুলো খাবার নিয়ে। জেনা আর জ্যাসনের দিকে খেয়াল নেই।

'চলো, প্লেনটার কাছে যাই,' জেনার দিকে চেয়ে বলল জ্যাসন। 'রাইফেলটা রয়ে গেছে। গুলিগুলোও আনতে হবে।'

চেয়ে রইল জেনা। হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

জ্যাসন বুঝল, তার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছে না মেয়েটা। অবশেষে ইঙ্গিতে দেখাল বিমানটা যেখানে পড়েছে সে-দিকে। পাথর থেকে নামল। জেনার হাত ধরে টান দিল।

নেকড়েগুলোর পাশ কাটিয়ে অনেক দূর দিয়ে ঘুরে বিধ্বস্ত বিমানের কাছে চলে এল ওরা। রাইফেল আর গুলির বাক্স বের করে নিল জ্যাসন। বলল, 'কোথায় যাবে তুমি? ঘর কোথায়?'

চুপ করে রইল জেনা।

ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করল জ্যাসন।

জেনা বুদ্ধিমতি। অবশেষে বুঝল কি বলতে চাইছে মানুষটা। হাত তুলে

টিপড়ার পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে বলল, 'জোরাম।'

জেনাকে গাঁয়ে পৌঁছে দেয়ার কথা বলল জ্যাসন। ইঙ্গিতে বোঝাল অনেক চেষ্টায়।

জেনা রাজি।

পথ দেখিয়ে এগোল জেনা। সঙ্গে সঙ্গে চলল জ্যাসন।

অনর্গল কথা বলছে দু'জনে। কিন্তু কেউ কারও কথা বুঝতে পারছে না। দু'জনেই জানতে চাইছে দু'জনের সম্পর্কে। অথচ বোঝাতে পারছে না বিশেষ কিছু।

অবশেষে অন্য উপায় বের করল জ্যাসন। প্রস্তর-যুগের মেয়েকে ইংরেজি শেখানোর কঠিন দায়িত্ব নিল। নিজের বুকে হাত রেখে কয়েকবার বলল, 'জ্যাসন···জ্যাসন···' এরপর মেয়েটার দিকে আঙুল তুলে হাত আর চোখের ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল জেনা। নিজের বুকে হাত রেখে বলল নিজের নাম।

টিপডার পাহাড়ের দিকে এগোতে এগোতে চলল দু'জনের ভাষা শেখা।

সময় যাচ্ছে। কিন্তু সেটা বোঝার উপায় নেই এই অনন্ত দুপুরের রাজ্যে। চলতে চলতে পথে যেখানে খিদে লাগছে, সেখানেই থামছে দু'জনে। ফলমূল আর পানির অভাব নেই। খেয়ে নিচ্ছে। বেশি ক্লান্ত হলে শুয়ে পড়ছে। জেনা ঘুমালে জ্যাসন পাহারা দেয়, জ্যাসন ঘুমালে জেনা। ইতিমধ্যে ভাষা শিখে নেয়ার চেষ্টা চলছে।

সময় কত গেল বলতে পারবে না জ্যাসন। এক সময় একটা বড় খাদের ধারে এসে দাঁড়াল দু'জনে। চওড়া বিশাল ফাটল, নিচে অন্ধকার। তলায় কি আছে দেখা যায় না ওপর থেকে।

'এবার কোন পথে যাব?' জিজ্ঞেস করল জ্যাসন।

'দেখি, পথ একটা বের করে নেব,' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জেনা।

পথ খুঁজে নিয়ে এগোল জেনা। পাশে জ্যাসন।

চলতে চলতে এক সময় ঘুরে দাঁড়াল জেনা, 'তুমি বার বার আমার দিকে চাও কেন? কি দেখো?'

ঝট করে চোখ ফিরিয়ে নিল জ্যাসন। মুখ লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ থেকে সত্যিই সে খুব বেশি তাকাচ্ছে জেনার দিকে।

'কথা বলছ না কেন?' আবার বলল জেনা।

'কি বলব?'

'যা বলতে চাও।' এবার লাল হয়ে উঠেছে জেনার গাল।

অবাক হয়ে গেল জ্যাসন। জেনার দিকে তাকাল। প্রস্তর যুগের এক অসভ্য মেয়ে, কাঁচা মাংস ঝকঝকে সাদা দাঁতে ছিঁড়ে খায়, প্রায় উলঙ্গ থাকে, শালীনতার কিচ্ছু জানে না, সেই মেয়ে তাকে···তাকে···

হোক অশিক্ষিত, আদিম যুগের, কিন্তু সে নারী। জ্যাসনের ভাব পরিবর্তন ঠিকই লক্ষ করল জেনা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার ঠোঁটের লজ্জারাঙা

হাসি। হঠাৎ কি যে হলো তার। হন হন করে এগোল যে খাদটার পাশ কাটিয়ে এসেছে একটু আগে সেটার দিকে।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল জ্যাসন, 'জেনা, কোথায় যাচ্ছ! জেনা, শোনো!'

থামল জেনা। মুখে মলিন হাসি। বলল, 'তোমার পথে চলে যাও তুমি, টিপডারের ছেলে। আমি আমার পথে যাই।'

*

ঠিক সেই সময় টিপডার পাহাড়ের এক প্রান্ত ঘুরে বিশাল গিয়র সমভূমিতে ঢুকছে একদল মানুষ। দলে ওরা এগারো জন। দলপতি শ্বেতাঙ্গ, বাকি সবাই কালো মানুষ। পথ হারিয়েছে ওরা। অনির্দিষ্ট ভাবে এগোচ্ছে। কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে যাবে কিচ্ছু জানে না।

এত অসহায় জীবনে আর কখনও বোধ করেনি মুভিরো। সে আর তার নয় জন ওয়াজিরি অরণ্যচারী। গহন বনে ছেড়ে দিলেও পথ চিনে ঠিক ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এখানে ওরা পুরোপুরি অসহায়। সব চেয়ে বড় বাধা ওই সূর্য। না দিচ্ছে সময়, না দেখাচ্ছে দিক।

হতাশ ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দলটা।

*

টারজান গেল, ফন হোর্স্ট আর মুভিরোর দল গেল, তারপর গেল জ্যাসন। কারও কোন খবর নেই। কেউ ফিরছে না। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠল জুপনার। শেষে আরেকটা দল সঙ্গে দিয়ে ডর্ফকে পাঠাল খোঁজ করতে।

সত্তর ঘণ্টা পরে ফিরে এল হতাশ ডর্ফ আর তার দল। কারও কোন খবর আনতে পারেনি।

চুপচাপ আর বসে থাকা যায় না। সঙ্গীদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে, যদি তারা জীবিত থাকে। ও-২২০ নিয়ে ওড়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। আকাশ থেকে খোঁজ করবে। পায়ে হেঁটে সুবিধা করা যাবে না, বুঝে গেছে।

বেশি দেরি করল না আর জুপনার। আকাশে উড়ল ও-২২০।

খরগোশের পা বের করে গালে বোলাল বাবুর্চি রবার্ট জোনস। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলল। তারপর বের করল তার তেল চিটচিটে ডায়েরী। তাতে লিখল: দুপুর বেলা রওনা হলাম আমরা।

নয়

ঘন কালো মেঘ জমছে পাহাড়ের মাথায়। চাপা গর্জন তুলে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

'বৃষ্টি আসবে,' আকাশের দিকে চেয়ে বলল টোয়ার। 'জোরামে হচ্ছে

এখন, এদিকেও হবে।'

দেখতে দেখতে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল অনন্ত সূর্য। এখানে আসার পর এই প্রথম প্রখর আলোর কবল থেকে মুক্তি পেল টারজান। দেখল, টোয়ার আর টারগাসের চোখে মুখে ভয়। জন্তু-জানোয়ারেরাও ভয়চকিত ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। বৃষ্টিকে এত ভয়?

'টোয়ার, ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

'তা কিছুটা পাচ্ছি। এখনই ঝরঝর করে পানি নামবে আকাশ থেকে। ভিজে চুপচুপে হয়ে যাব। উঁচু জায়গায় রয়েছি, নইলে পানির স্রোতে ভেসেই যেতাম। ভরে যাবে সব গুহা, ডোবা, খানাখন্দ। আকাশ থেকে আগুনের বর্শাও ছুটে আসবে। গায়ে লাগলেই খতম!'

বাতাস বইতে শুরু করল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীত করে উঠল টারজানের। ঠাণ্ডা সহজে কিছু করতে পারে না তার। কিন্তু এ যেন মেরুর শৈত্যপ্রবাহ। কাঁপতে শুরু করল সে। তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে হাত-পা গরম করতে লাগল।

এল বৃষ্টি। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে নয়। হঠাৎ নেমে এল ঝমঝম করে। ওপরের লক্ষ লক্ষ ঝাঁঝরি একসঙ্গে খুলে দিয়েছে যেন কেউ। বাতাসের গর্জনে কান ঝালাপালা, তার ওপর থেকে থেকেই পড়ছে বাজ, বিকট শব্দে। চমকে চমকে উঠছে যেন ধরণী।

বৃষ্টির প্রথম চোটেই নিভে গেল আগুন। আশেপাশে গুহা চোখে পড়ছে না, গা বাঁচানোর কোন উপায় নেই। খোলা আকাশের নিচে বসে বসে ভিজছে তিনজনে। আশঙ্কা করছে বাজ পড়ার। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে ওরা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে। একটা বাজ কারও গায়ে পড়লে তিনজনেই শেষ হয়ে যাবে।

খুব বেশিক্ষণ থাকল না বৃষ্টির অত্যাচার। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। দেখতে দেখতে কেটে গেল মেঘ। আবার হেসে উঠল অনন্ত সূর্য, মাথার ওপরে ওই একই জায়গায় রয়েছে।

'খিদে পেয়েছে,' প্রথম কথা বলল টারজান।

মাংসের অভাব নেই। বাজ পড়ে মরে আছে অসংখ্য জানোয়ার। একটা হরিণ তুলে নিয়ে এল টারগাস। গাছপালা, মাটি, পাথর সব ভেজা। আগুন জ্বালানোর উপায় নেই। কাঁচা মাংস খেয়েই খিদে মেটাতে হলো ওদের।

বৃষ্টির তোড়ে ধুয়ে মুছে গেছে পায়ের ছাপ আর অন্য চিহ্ন। অনুসরণ করার উপায় নেই। কোন্‌দিকে এগোবে?

টোয়ার বলল, 'জোরামের দিকেই এগোব। পথে কোথাও বৃষ্টি না হয়ে থাকলে আবার চিহ্ন খুঁজে পাব ওদের। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

চলল ওরা।

বিশাল একটা খাদের পাড়ে এসে থামল এক সময়। এদিকেও বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা মাটিতে জুতোর ছাপ দেখতে পেল টোয়ার। বসে পড়ে পরীক্ষা করল। বলল, 'হুঁম্‌ম্‌! এদিক দিয়েই গেছে ওরা!'

আবার পা বাড়াতে যাবে, এই সময় চাপা একটা গুঞ্জন শোনা গেল আকাশে। চমকে মুখ তুলে চাইল তিনজনেই।

'টিপডার! টিপডার!' প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল টারগাস আর টোয়ার। পাগলের মত তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। লুকিয়ে পড়ার জায়গা খুঁজছে নেই। খাদের তলায় নেমে যেতে পারে, তবে তত সময় আছে কিনা সন্দেহ। এসে পড়েছে টিপডার। ওরা ফাটলের দেয়ালে থাকতে থাকতেই ছোঁ মারবে।

'ভয় কি?' সাহস দিল টারজান। 'আমরা তিনজন। এক সঙ্গে লড়াই করব টিপডারের বিরুদ্ধে।'

'তিনজনেও ওটার সঙ্গে পারা মুশকিল। ভয়ঙ্কর জীব!'

'আমাদেরকেই আক্রমণ করবে, জানলে কি করে?'

'মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে…'

'আসছে! এসে গেছে!' টোয়ারের কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল টারগাস।

বল্লম বাগিয়ে তৈরি হলো টোয়ার। তীর-ধনুক নিয়ে টারজানও তৈরি। মুগুরে হাতের চাপ শক্ত হলো টারগাসের।

এসে গেল টিপডার। মানুষগুলোর মাথার ওপরে চক্কর দিল একবার। তারপরই শাঁ করে নেমে আসতে লাগল।

তীর ছুঁড়ল টারজান, পর পর তিনটা। সব কটাই বিঁধল টিপডারের গায়ে। এভাবে আক্রান্ত হয়নি আর কখনও পাখিটা। ভড়কে গিয়ে আবার উঠে পড়ল খানিকটা। তারপর হঠাৎ ঝাঁপ দিল। কেউ কিছু করার আগেই নেমে এল অবিশ্বাস্য গতিতে। ছোঁ মেরে টারজানকে তুলে নিয়ে উড়ে গেল। একবার পাক খেয়ে উড়ে চলল সোজা।

অসহায় হয়ে পড়েছে টারজান। অনেক ওপরে রয়েছে। এখানে এই অবস্থায় টিপডারের সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়। বেশি ব্যথা পেলে হয়তো ছেড়ে দেবে তাকে পাখিটা! পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, কঠিন পাথরে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে টারজান। চুপ করে রইল সে। দেখাই যাক, কোথায় নিয়ে যায় তাকে টিপডার। পরে লড়াই করার সুযোগ আসতেও পারে।

শাঁ শাঁ করে উড়ে চলেছে টিপডার। নিচে তাকিয়ে আছে টারজান। একেক জায়গায় প্রকৃতি একেক রকম। দ্রুত বদলে যাচ্ছে চেহারা। পাহাড় ছাড়িয়ে তৃণভূমি, তারপর আবার পাহাড়—গ্র্যানিটের। আরও মাইলখানেক উড়ল টিপডার। শ্লথ হয়ে এল গতি। নিচে উঁচু পাহাড়। এখানে ওখানে বড় বড় ফাটল, হাঁ করে আছে। একটা চূড়ায় ঝুড়ির মত ছড়ানো বড় একটা অগভীর গর্ত। তাতে কালো কালো কি যেন নড়ছে।

চূড়ার ওপরে একবার চক্কর দিল পাখিটা। তারপর নামতে শুরু করল ধীরে ধীরে। টারজান দেখল, গর্তটায় টিপডারের বাসা, কালো কালোগুলো টিপডারের ছানা। ওদের জন্যে খাবার এনেছে মা।

কোমর থেকে ছুরি খুলে আনল টারজান। এক হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল

টিপডারের আঁশাল পা। খোঁচা মারল রানের মাংসে। চেঁচিয়ে উঠল পাখিটা। টারজানের ওপর থেকে ক্ষণিকের জন্যে আলগা হয়ে গেল নখ। আবার আঁকড়ে ধরার আগেই দ্বিতীয়বার খোঁচা মারল টারজান। আলগা নখের ভেতর থেকে বেরিয়ে পা বেয়ে উঠে গেল ওপরে। কোনভাবেই পাখিটা আর ধরতে পারছে না তাকে, নখ দিয়েও না ঠোঁট দিয়েও না। টিপডারের বুকে খোঁচা মারল টারজান। একবার···দু'বার···তিনবার। তীরের ঘায়ে এমনিতেই কাবু হয়ে পড়েছে টিপডার, ছুরির মারাত্মক খোঁচা আর সইতে পারল না। বিকট চিৎকার করে উঠে বাসার ভেতরেই টলে পড়ল সে। টারজান পড়ল তার ডানার তলায়।

ছানাগুলো খুবই ছোট, কিছুই করতে পারল না টারজানের। ঠোকর মারতে এসে জবাই হয়ে গেল। মরা টিপডারের বিশাল ডানার নিচ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত টারজান। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল খাদের বাইরে। প্রায় খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের ঢাল, তিনশো ফুট নিচে শেষ হয়েছে। সঙ্গে দড়ি রয়েছে টারজানের, কিন্তু মাত্র পঁচিশ ফুট লম্বা। ওটা দিয়ে কোন কাজ হবে না। কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। ছুরিটা কোমরে গুঁজে নিয়ে দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। ছোট-বড় খাঁজ রয়েছে, তা ছাড়া এখানে ওখানে বেরিয়ে আছে পাথরের কোণা। ওগুলোতে হাত পায়ের আঙুল বাধিয়ে কোনমতে নেমে চলল অতি ধীরে ধীরে।

শেষ হলো একসময় এই নামার পালা। কিন্তু স্নায়ুর ভেতর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে টারজানের। শরীরেরও এখানে ওখানে কেটে ছড়ে গেছে চোখা পাথরের খোঁচায়। রক্ত ঝরছে কোন কোন ক্ষত থেকে। জ্বালা-যন্ত্রণা করছে কিন্তু এ সব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না সে। একটা পাথরে বসে খানিক জিরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়। ওটার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। নাক তুলে বাতাস শুঁকল। বিচিত্র একটা গন্ধ পাচ্ছে। চেনা, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না। সেই সঙ্গে মিশে আছে মানুষের গন্ধ। বিপদ নয় তো!

একপাশে তাকাল টারজান। একটা গিরিপথের ভেতর থেকে আসছে গন্ধটা।

পথটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল টারজান। আরেকবার গন্ধ নিল নাক তুলে। না, কোন সন্দেহ নেই, পাহাড়ের ভেতর থেকেই আসছে গন্ধ। গিরিপথ ধরে এগিয়ে চলল সে সাবধানে।

মোড় ঘুরেই জীবটাকে দেখতে পেল টারজান। বিশাল এক ভালুক। এতবড় ভালুক জীবনে দেখেনি। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ওটা নিঃশব্দে। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় শিকারের পিছু নিয়েছে। সাবধানে টারজানও এগোল ওটার পেছনে। মানুষের গন্ধ পাচ্ছে, নিশ্চয় মানুষটাকে আক্রমণ করতেই এগোচ্ছে জানোয়ারটা।

আরেকটা মোড় নিয়ে ছেলেটাকে দেখতে পেল টারজান। হাতে বল্লম

নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পেছনে ধীর পায়ে এগোচ্ছে মৃত্যু। টেরই পায়নি।

দশ

জেনা কেন রেগে গেছে বুঝতে পারছে না জ্যাসন। নিশ্চয় একা একা এখন জোরামে ফেরার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেটা মোটেই উচিত হবে না। পথে হাজারো বিপদ ওত পেতে আছে। পেছনে চলল সে।

হঠাৎ ঘুরে তাকাল জেনা। জ্যাসনকে আসতে দেখে বাঘিনীর মত ফুঁসে উঠল, 'তোমাকে কে আসতে বলল? চলে যাও। নইলে খুন করে ফেলব।' ছুরি বাগিয়ে ধরল সে।

'তোমাকে একলা যেতে দেব না আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাসন।

'তা হোক। তবু আমি আসব। জেনা, আমরা বন্ধু। এরকম ব্যবহার করছ কেন?'

'কে বলল আমরা বন্ধু? তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না···।'

'অত শত বোঝার দরকারও নেই। শুধু এটুকু বুঝি, কেউ আমার পিছু নিলে তাকে খুন করে ফেলতে হবে।'

'পারলে করো,' বলল জ্যাসন। 'তোমার পিছু নেবই আমি। বিপদের মুখে একলা ছেড়ে দিতে পারব না।'

দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে এল জেনা। পাথরের ছুরি তুলে ধরল। গেঁথে দেবে জ্যাসনের বুকে। কিন্তু মানুষটার হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে হাত কেঁপে গেল তার, চোখের আগুনে তাকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল বোধহয়। এক ঝটকায় ঘুরেই ছুটতে শুরু করল সে।

পিছু নিল জ্যাসন।

একনাগাড়ে ছুটল ওরা কিছুক্ষণ। হরিণীর মত হালকা গতি জেনার। তা ছাড়া গায়ে কাপড়ের বোঝা নেই। ছোটা তার পক্ষে সহজ। জ্যাসনের ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। অচেনা অজানা পথ। তা ছাড়া এভাবে ছুটতে অভ্যস্ত নয় সে। তার ওপর রয়েছে বোঝা—হাতে রাইফেল, গুলির বাক্স, গায়ে ভারী পোশাক, পায়ে ভারী বুট। হাঁপিয়ে উঠল সে। আর তাল রাখতে পারছে না মেয়েটার সঙ্গে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে।

হাতের রাইফেলটা ভীষণ ভারী লাগছে জ্যাসনের। ফেলে দেবে? না, উচিত হবে না। এখানে ওটা ভীষণ দরকার। কখন আবার কোন বিপদ এসে হাজির হয়, কে জানে!

সামনে বিশাল এক ফাটল। সেটার সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল জেনা। ঘুরে তাকাল।

ছুটতে ছুটতে কাছে চলে এল জ্যাসন। উঁকি দিয়ে একবার চাইল খাদের দিকে! গভীর খাদ, অতল অন্ধকার।

ছুরি উঁচিয়ে ধরল জেনা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তোমাকে চলে যেতে বলেছি। তবু আসছ কেন?'

'বোকামি কোরো না, জেনা,' বলল জ্যাসন। 'পথে অনেক বিপদ। আমি না এলে কে সাহায্য করবে তোমাকে?'

ব্যঙ্গ করে হাসল জেনা। 'তুমি করবে সাহায্য? জানো, কোথায় এসেছি? এটা টিপডার পাহাড়। এখানে তুমি আমার সঙ্গে থাকলেও যা না থাকলেও তা। টিপডারের বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করার নেই। তোমার এই আগুনে-বল্লম সুদ্ধই তোমাকে গিলে খাবে টিপডার। ফিরে যাও, যে দেশে তোমার মত কাপুরুষরা বাস করে। জোরামের লাল ফুল এমন এক জায়গা দিয়ে যাবে, যেখান দিয়ে একমাত্র পুরুষেরাই যেতে পারে। যাও, ভাগো।'

'আমি কি পুরুষ নই?'

'তুমি! হাসালে! তুমি তো একটা শুঁয়াপোকারও অধম।'

'বেশ তাহলে তাই। কিন্তু আমি যাবই তোমার সঙ্গে। শুঁয়াপোকা হলেও পুরুষ শুঁয়াপোকা, সেটা প্রমাণ করে দেব।'

'অত প্রমাণের দরকার নেই আমার। বলেছি আসবে না, এসো না, ব্যস,' বলেই খাদের ধার দিয়ে নেমে পড়ল জেনা। খাড়া দেয়ালের গা বেয়ে নামতে শুরু করল।

কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে আছে জ্যাসন। বিস্মিত হয়ে দেখছে জেনার কাণ্ড। খাড়া দেয়ালের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে টিকটিকির মত! অবিশ্বাস্য! কিন্তু একটা মেয়ে···একটা মেয়ে চ্যালেঞ্জ করে গেল তাকে! পিছিয়ে এসে তৈরি হতে শুরু করল সে।

জুতো খুলে একটার ফিতে আরেকটার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে নিল গলায়। রাইফেলটা ঝোলাল কাঁধে। পকেটে ভরে নিল গুলিগুলো। কোমরের বেল্টে খাপে রয়েছে রিভলভার, ভাল জায়গায়ই রয়েছে। আবার এসে খাদের কিনারে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল। আরে, জেনা কোথায়! দেখা যাচ্ছে না তাকে। খাদের তলায় অন্ধকারে নেমে গেল! ধরতে হলে তাড়াতাড়ি করা দরকার। আর চিন্তাভাবনা না করে কিনার ধরে নেমে পড়ল জ্যাসন। জানলই না, দেয়ালের একটা ফাটলের ভেতর থেকে এক জোড়া চোখ লক্ষ করছে তাকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে অতি সাবধানে নেমে চলেছে জ্যাসন। বার-বার কানে বাজছে—একমাত্র পুরুষেরাই যেতে পারে! সে পুরুষ···সে পুরুষ···প্রমাণ করে ছেড়ে দেবে। ভয়, ক্লান্তি সব যেন ভুলে গেল জ্যাসন। নেমে চলল একগুঁয়ের মত। ছড়ে ছিলে যাচ্ছে হাত-পায়ের আঙুলের চামড়া, বুক আর হাঁটু, গ্রাহ্যই করছে না।

এক সময় অসাড় হয়ে এল আঙুল। আর পারছে না জ্যাসন। অনুশোচনা জাগছে এখন, গোঁয়ারের মত কাজটা করা উচিত হয়নি। আর নামার ক্ষমতা তার নেই। হাত-পা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে। যা হয় হোক, তলার পাথরে

আছড়ে পড়ে মৃত্যু ঘটলে ঘটুক, পরোয়া করে না সে। চোখ বন্ধ করে হঠাৎ ছেড়ে দিল হাত-পা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাটি ঠেকল পায়ে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখেনি হাত-পা ছাড়ার আগে। মাত্র কয়েক ফুট ওপরে ছিল জ্যাসন। নিরাপদেই নেমে এসেছে তলায়। ফুঁপিয়ে উঠে ধপ করে বসে পড়ল সে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। কান্নার মত এক ধরনের চাপা আওয়াজ বেরোচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে।

ফাটলের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে মুখটা। চোখে বিস্ময়। স্বস্তিও ফুটেছে একই সঙ্গে।

হঠাৎ মেঘ ডাকল। চমকে মুখ তুলে তাকাল জ্যাসন। আরে, পেলুসিডারে বৃষ্টি, নাকি কোন আজব জন্তু-জানোয়ারের ডাক! না, মেঘই। কালো হয়ে গেছে আকাশ। অনন্ত সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে। আসুক বৃষ্টি। রোদ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে পড়েছে। বৈচিত্র্য মন্দ লাগবে না।

কিন্তু জ্যাসনের মত এত নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না জেনা। পেলুসিডারের বৃষ্টির ধরন জানা আছে তার। শিগগিরই মানুষটাকে সরিয়ে নিতে হবে কোথাও। নইলে বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাবে স্রোতের মুখে কুটোর মত।

জেনা নিচে নামার আগেই শুরু হলো বৃষ্টি। দেখতে দেখতে হু-হু করে পানির স্রোত বইতে শুরু করল খাদের তলা দিয়ে। আবার ফাটলে আশ্রয় নিতে হলো জেনাকে।

অবাক হয়ে গেল জ্যাসন। এমন কাণ্ড জীবনে দেখেনি সে। মাত্র শুরু হয়েছে বৃষ্টি, এরই মাঝে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে পানি জমে গেছে! স্রোত আরও জোরাল হলে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি উঁচু কোন জায়গায় উঠে যাওয়া দরকার।

তীব্র স্রোতের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না জ্যাসন। জোর এক ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কাঁধ থেকে ফিতে ছিঁড়ে ছুটে গেল রাইফেলটা, ভেসে গেল জুতোজোড়া। ওগুলো উদ্ধারের কোন উপায় নেই। প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল এখন। হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরানোর চেষ্টা চালাল সে। খাবি খেতে খেতে কোনমতে ভেসে রইল, ভেসে চলল স্রোতে। শুধু ভেসে থাকতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে না। একের পর এক বাজ পড়ছে এদিক ওদিক। কাছেপিঠে ওরকম একটা পড়লেই সর্বনাশ।

একটা উঁচু পাথর চোখে পড়ল জ্যাসনের। কোনমতে ওটাতে যদি উঠে বসা যেত। কিন্তু স্রোতের যা বেগ, ওটাতে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবু চেষ্টা করতে হবে।

অনেক চেষ্টায় কোনমতে পাথরটার ওপর উঠে বসল জ্যাসন। একনাগাড়ে বৃষ্টি ঝরছে। বাড়ছে পানি। আর বেশিক্ষণ লাগবে না, পানিতে ডুবে যাবে পাথর।

পাথরটা প্রায় ডুবে গেছে, এই সময় যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ

করেই থেমে গেল বৃষ্টি। নেমে গেল পানি ধীরে ধীরে।

পাথরের ওপর থেকে নামল জ্যাসন। অনেক দূরে তাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে স্রোত। জেনাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। খাদের তল ধরে হাঁটতে শুরু করল জ্যাসন। শিগগিরই বেরিয়ে এল রোদ ঝলমলে উপত্যকায়। ও-২২০তে ফেরা দরকার, কিন্তু কোন্ পথে ফিরবে? কোন্ দিকে আছে এখন আকাশযানটা, তাই তো জানে না।

একদিকে হাঁটতে শুরু করল জ্যাসন। এক জায়গায় একটা পাখির বাসায় ডিম দেখে খেয়ে পেট ভরল। পানি খেয়ে নিল ঝর্ণা থেকে। জামাকাপড় সব ভেজা, ওগুলো খুলে রোদে শুকাতে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

কতক্ষণ পর ঘুম ভাঙল বলতে পারবে না জ্যাসন। কিন্তু সে ভাবনার আর প্রয়োজন কি? কাপড়চোপড় পরে আবার হাঁটতে শুরু করল। চলতে চলতে সমভূমি পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বাতাসে মাংস ঝলসানোর গন্ধ। একটা মোড় ঘুরেই লোকটাকে দেখতে পেল সে। আগুন জ্বেলে মুরগী ঝলসাচ্ছে একজন মানুষ—ব্রোঞ্জের মত দেহের রঙ, চমৎকার স্বাস্থ্য। কোমরের কাছে শুধু একটা কৌপীন জড়ানো। লোকটা কি শত্রু? সামনে গেলে আক্রমণ করে বসবে না তো?

যাবে কি যাবে না দ্বিধা করছে জ্যাসন। হঠাৎ লোকটার পাশের পাহাড়ের ওপরে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠতে দেখল। আরে! কি ওটা? মুখটা লম্বাটে—অনেকটা টিকটিকির মুখের মত। লেজের ডগায় চোখা কাঁটা বসানো। পিঠে অনেকগুলো ত্রিকোণ-চারকোণ ঢাল যেন দুই সারিতে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে! প্রাগৈতিহাসিক স্টেগোসরাস! জানে জ্যাসন, ওরা মাংসাশী নয়! তাহলে ঝাঁপ দেয়ার পাঁয়তারা করছে কেন?

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল স্টেগোসরাস। চার পা টিকটিকির মত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপ দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে। পিঠের ঢালগুলো কাত হয়ে গেছে দু'পাশে। আশ্চর্য কৌশলে বাতাসে ভেসে যেন নেমে আসছে এতবড় জীবটা।

লোকটাকে বাঁচাতে হলে এখনি কিছু একটা করা দরকার। টান দিয়ে কোমরের খাপ থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে সামনে এগোল জ্যাসন।

এগারো

ধনুকে তীর পরাল টারজান। একবার দ্বিধা করেই ছুঁড়ে দিল তীর। কানফাটা গর্জন করে ঘুরল ভালুকটা। নতুন শত্রু দেখে আরেকবার গর্জে উঠল। তারপর ছুটল আক্রমণ করতে। আবার তীর ছুঁড়ল টারজান। আবার। একের পর এক তীর বিদ্ধ হচ্ছে ভালুকের শরীরে। কিন্তু ছুটে আসার বিরাম নেই দানবটার।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। পালাল না। বরং এগিয়ে এল কয়েক পা। গায়ের জোরে বল্লম ছুঁড়ে মারল ভালুকের পিঠে। টলে উঠল দানব। ঝাড়া দিয়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করল শরীরে বেঁধা বল্লম।

তিন লাফে পৌঁছে গেল টারজান। ধনুক ফেলে দিয়েছে। হাতে ছুরি।

তীর আর বল্লমের খোঁচায় কাবু হয়ে এসেছে ভালুক। তবু হাল ছাড়ল না। বিকট চিৎকার করে আক্রমণ করল টারজানকে।

একপাশ থেকে ভালুকটার গলা জড়িয়ে ধরল টারজান। ভীষণ থাবার মারাত্মক নখ বাঁচিয়ে রেখেছে কোনমতে, সেই অবস্থায়ই ছুরি চালাল ভালুকের গলার সামান্য নিচে। টান দিয়ে চিরে দিল অনেকখানি। তারপর গলা ছেড়ে দিয়েই আবার ছুরি চালাল ওটার গলার একপাশে। কেটে দিল রক্তবাহী নালী। আর সইতে পারল না ভালুক। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করল, বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। অবাক চোখে দেখছে টারজানকে।

রক্তাক্ত ছুরি হাতে ঘুরল টারজান। ভয় পেয়ে ছেলেটাকে পিছিয়ে যেতে দেখে হেসে বলল, 'ভয় নেই। আমি টারজান। বন্ধু।'

অভয় পেয়ে ছেলেটাও হাসল। 'আমি ওভান, ক্লোভির রাজার ছেলে। কেন এসেছ? মেয়ে চুরি করতে?'

'না, টারজান চুরি করে না।'

'ক্লোভিতে আসার জন্য আসিনি। পেলুসিডারে এসেছি একজনকে উদ্ধার করতে। সেটা তোমার না জানলেও চলবে। আমাকে আক্রমণ না করলে আমি কারও কোন ক্ষতি করি না, এটুকু জেনে রাখো, ব্যস।'

মাথা চুলকে কি যেন ভাবল ছেলেটা। 'তাহলে ভালুকটাকে আক্রমণ করলে কেন?'

'না করলে ওটা তোমাকে মেরে ফেলত। কোন জানোয়ার মানুষ মেরে ফেলুক, এটা টারজান চায় না।'

টারজানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল ছেলেটা।

'বেশ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। তবে গাঁয়ে ঢুকে উল্টো-পাল্টা কিছু করে বসো যদি, মরবে। ক্লোভির যোদ্ধারা মেরে ফেলবে তোমাকে।'

'না, উল্টো-পাল্টা কিছু করব না। চলো যাই। কোথায় তোমাদের গাঁ!

'কাছেই।'

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে ওরা। টারজান জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এসেছিলে কেন?'

'শিকার করতে।'

একটু চুপ করে থেকে টারজান বলল, 'তোমার বাবার কথা বলো। তোমাদের গাঁয়ের কথা বলো।'

'আমার বাবা ক্লোভির রাজা, তার নাম আভান। মস্ত বড় যোদ্ধা। আমাদের গাঁয়ের লোকেরাও খুব ভাল যোদ্ধা। প্রায়ই জোরামের লোকের সঙ্গে আমাদের লড়াই বাধে। একবার তো জোরাম ছাড়িয়ে দারোজে চলে

গিয়েছিলাম আমরা যুদ্ধ করতে। ওই দুটো গাঁ থেকে মেয়েমানুষ ধরে আনতে যায় আমাদের পুরুষরা। আজও গেছে এক সর্দার বিশজন লোক নিয়ে, তার নাম কার্ব।'

'ক্লোভি থেকে জোরাম কত দূরে?'

'কেউ বলে কাছে, কেউ বলে দূরে। তবে যাওয়ার চেয়ে ফেরাটা বোধহয় সহজ। কারণ যাওয়ার সময় যোদ্ধাদের খেতে হয় ছ'বার, ফেরার সময় দু'বার।'

'কেন? যাওয়ার সময় ঘুর পথে যায় নাকি?'

'না। ফেরার সময় দুশমনেরা তাড়া করে। তাড়া খেয়ে ছুটে আসে তো, সময় বেশি লাগে না।'

হেসে ফেলল টারজান।

এগিয়ে চলেছে দু'জনে। টারজানের গায়ের ক্ষতগুলো দেখে, কি করে হয়েছে জিজ্ঞেস করল ওভান। কি করে টিপডারে আক্রমণ করেছিল, কি করে বেঁচে ফিরে এসেছে বলল টারজান।

অবাক হয়ে শুনল সব ওভান। এক জায়গা থেকে কয়েকটা লতাপাতা তুলে নিয়ে কচলে তার রস টারজানের ক্ষতে লাগিয়ে দিল। ম্যাজিকের মত কাজ হলো। শিগগিরই ব্যথা আর জ্বালাযন্ত্রণা কমে গেল ক্ষতস্থানের।

'বাহ্, চমৎকার ওষুধ তো!' বলল টারজান।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল ওভান, 'ক্ষতও শুকিয়ে যাবে শিগগিরই।'

চলতে চলতে একটা গিরিখাতের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওভান বলল, 'এসে গেছি। কথাবার্তা খুব সাবধানে বলবে, সতর্ক থাকবে। কখন কে কি করে বসে বলা যায় না। গোলমাল বাধাতে ওস্তাদ ক্লোভির লোকেরা।'

গাঁয়ে ঢুকল ওরা। ঘরবাড়ি নেই। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। ওগুলোতেই বাস করে ক্লোভিরা। খোলা একটা জায়গায় জটলা করছে নারী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে। দু'জনকে দেখে হৈ-হৈ করে ছুটে এল। ঘিরে ধরল। ছুরি আর মুগুর নিয়ে টারজানকে মারতে উদ্যত হলো কয়েকজন যোদ্ধা।

'খরবদার!' চেঁচিয়ে উঠল ওভান। 'ওকে মেরো না। সর্দার আভান কোথায়?'

একটা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী এক মানুষ। গম্ভীর গলায় বলল, 'কি হলো, ডাকাডাকি করছিস কেন? লোকটা কে?'

'আমার বন্ধু,' বলল ওভান। 'টারজান, ও ক্লোভির রাজা, আমার বাবা।'

'ও বিদেশী। ও ক্লোভিদের বন্ধু হতে পারে না,' বলল আভান।

'ও বন্ধু। রিথের হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে।' ক্লোভির ভাষায় রিথ মানে ভালুক।

টারজানের দিকে চেয়ে কি ভাবল আভান। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এখন বন্দী করে রাখা হবে ওকে। কার্ব ফিরে আসুক। আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে তখন।'

একটা গুহায় বন্দী করে রাখা হলো টারজানকে। তবে তার খাবারের

কোন অসুবিধা হলো না। ওভান, তার মা আর বোন প্রচুর খাবার দিয়ে গেল। ওরা বেরিয়ে যেতেই গুহার পাথরের দরজা আটকে দিল প্রহরীরা বাইরে থেকে।

অন্ধকার গুহা। ভেতরে মশালের লালচে আলো। দেয়ালে দেয়ালে নানা জীব-জন্তু, মানুষের সঙ্গে মানুষের, জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের নানারকম ছবি। অবাক হয়ে দেখছে ওসব টারজান।

সময় কতক্ষণ কাটল বলতে পারবে না। হঠাৎ বাইরে একটা সম্মিলিত চিৎকার শোনা গেল, 'কার্ব ফিরেছে! কার্ব ফিরেছে! দেখো, কি সুন্দর একটা মেয়েকে ধরে এনেছে!'

এরপর অনেক কথা কানে এল টারজানের, কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। তবে এটুকু বোঝা গেল, মেয়েটাকে কে নেবে এই নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে। টারজানের ব্যাপারেও আলোচনা হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওভানের বোন একটা মেয়েকে নিয়ে এসে ঢুকল গুহায়। বলল, 'এখানেই থাকতে হবে এখন তোমাকে। যার ভাগে পড়বে, নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে তার গুহায়। তবে সেটা পরে।'

বেরিয়ে গেল ওভানের বোন। বাইরে থেকে পাথরের দরজা আটকে দিল আবার প্রহরীরা।

বসে বসে কাঁদছে মেয়েটা।

খানিকক্ষণ দ্বিধা করে শেষে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল টারজান। 'তুমি কি টোয়ারের বোন?'

চমকে মুখ তুলল মেয়েটা। 'তুমি জানলে কি করে?'

'তোমার ভাই আর আমি একসঙ্গে শিকার করেছি। জোরামের দিকে যাচ্ছিলাম, পথে গোলমাল হয়ে গেল। আমি আলাদা হয়ে গেলাম ওর কাছ থেকে। তোমার পায়ের ছাপ দেখেছি আমরা।'

'টোয়ার এখন কোথায়?'

'জানি না। আমাকে একটা টিপডার ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওটাকে মেরে ফেলেছি।'

'টিপডারকে···মেরে···ফেলেছ!' হাঁ করে টারজানের দিকে চেয়ে আছে জেনা। বিশ্বাস করতে পারছে না।

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে পেল কোথায় ক্লোভিরা? তোমার সঙ্গের সাদা মানুষটা কোথায়?'

'টিপডার পাহাড়ের এক খাদের ধার থেকে ধরে এনেছে। কিন্তু সাদা মানুষটার কথা···'

'বললাম না, পায়ের ছাপ দেখেছি। কোথায় লোকটা? ও আমার বন্ধু?'

'তোমার বন্ধু···' দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল জেনা।

মশাল হাতে এসে ঢুকল ওভান। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'টারজান, জলদি পালাতে হবে তোমাকে। ওদেরকে ঠেকাতে পারলাম না। তোমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে ঠিক করেছে। বাবা তোমার পক্ষেই কথা বলেছে। কিন্তু

শেষে সবার কথা মানতে বাধ্য হয়েছে।'

'কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে পালাব?' শান্তকণ্ঠে বলল টারজান।'

অবাক হলো ওভান। সামান্যতম উত্তেজিত হলো না মানুষটা, ভয় পেল না। 'এসো, আমার সঙ্গে।'

'এসো, জেনা,' ডাকল টারজান।

'মেয়েটাকে নেবে কেন? ওকে তো কার্বের জন্যে রাখা হয়েছে,' ভুরু কুঁচকে গেছে ওভানের।

'ও আমার বন্ধুর বোন। এসো জেনা দেরি কোরো না,' নিচু হয়ে মেয়েটার হাত ধরে টান দিল টারজান।

আর আপত্তি করল না ওভান। মশাল হাতে এগিয়ে চলল আগে আগে।

গুহার অনেক ভেতরে একটা দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওভান। একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'এখানে একটা পাথর আছে, ভালমত না খেয়াল করলে বোঝা যায় না।'

ঠেলে পাথরটা দেয়ালের গা থেকে সরিয়ে ফেলল ওভান। সরু একটা সুড়ঙ্গমুখ বেরোল।

'এ পথে বেরিয়ে যেতে পারবে পাহাড়ের অন্যপাশে। পথটা চিনি কেবল আমি আর বাবা। যাও, ঢুকে পড়ো, দেরি কোরো না। যে কোন সময় এসে পড়তে পারে ওরা,' বলল ওভান।

'তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?' বলল টারজান। 'মানে আমরা পালিয়ে গেছি দেখলে...'

'বাবা কিছু বলবে না। তবে খুব খেপে যাবে কার্ব মেয়েটাকে না পেলে। আমাকে সন্দেহ করবে হয়তো, কিন্তু কিছু করতে সাহস পাবে না। তা ছাড়া জানতেও পারছে না, কোন্ পথে কি করে পালিয়েছ তোমরা। তোমরা বেরোলেই পাথরটা আগের জায়গায় বসিয়ে দেব আবার।'

হৈ-চৈ শোনা গেল গুহার দরজায়। এসে গেছে ওরা টারজানকে ধরে নিয়ে যেতে।

জেনাকে সুড়ঙ্গের ভেতর ঠেলে দিয়ে ফিরে তাকাল টারজান। 'বিদায়, ওভান।'

'বিদায়, বন্ধু।'

অচেনা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল টারজান।

বারো

স্টেগোসরাসটা শূন্যে থাকতেই গুলি চালাল জ্যাসন।

রিভলভারের গুলিতে দানবীয় ডাইনোসরের কিছু হোক বা না হোক, মানুষটা চমকে উঠল। খাবার থেকে মনোযোগ সরে যেতেই জ্যাসনকেও

দেখল সে, স্টেগোররাসটাকেও দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বল্লমটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। অল্পের জন্যে ডাইনোসরটা পড়ল না তার ওপর।

শুরু হয়ে গেল লড়াই। বার বার লেজের বাড়ি মেরে লোকটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছে স্টেগোসরাস, কিন্তু লাগাতে পারছে না। সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে মানুষটা। পরক্ষণে বল্লমের খোঁচা খাচ্ছে ডাইনোসর। সেই সঙ্গে একের পর এক গুলি এসে বিঁধছে শরীরে।

বেশিক্ষণ টিকতে পারল না স্টেগোসরাস। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা। অসংখ্য ক্ষত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে খুলি।

অবাক হয়ে একবার স্টেগোসরাস একবার জ্যাসনের দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। বিশ্বাসই করতে পারছে না, হাতের ছোট্ট জিনিসটা দিয়ে এতবড় জীবটাকে মেরে ফেলেছে ওই বিদেশী।

একটা কথা মনে পড়ে গেল লোকটার, ওই মানুষ টারজানের বন্ধু নয় তো? জেনাকে সে-ই চুরি করেনি তো? টারজানের কাছে শেখা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

প্রস্তরযুগের মানুষের মুখে ইংরেজি শুনে জ্যাসন অবাক। বলল, 'আমি জ্যাসন গ্রিডলে, তুমি কে?'

'আমি টোয়ার। জোরামের লোক।'

'জোরামের লোক?...তুমি লাল ফুলকে চেনো?'

'নিশ্চয়। জেনা আমার বোন। তুমি নিশ্চয় টারজানের বন্ধু।'

'টারজানকে চেনো নাকি তুমি? দেখেছ?'

'হ্যাঁ। আমরা তিনজন একসঙ্গে শিকার করেছি। একসঙ্গে জোরামে চলেছিলাম। পথে তাকে টিপডারে ধরে নিয়ে গেল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল টোয়ার।

'টিপডারে ধরে নিয়ে গেছে! মুখ কালো হয়ে গেছে জ্যাসনের।'

'হ্যাঁ। যাকে টিপডারে ধরে তাকে আর কোনদিন ফেরত পাওয়া যায় না।'

টারজান মারা গেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না জ্যাসন। ডেভিস ইনেসকে উদ্ধার করতে এসেছে ওরা, সে কাজ একটুও এগোয়নি। এরই মাঝে টিপডারের কবলে মৃত্যু ঘটল দলের নেতার।

'বন্ধুকে খুব ভালবাসতে তুমি, না?' জিজ্ঞেস করল টোয়ার।

'হ্যাঁ, আস্তে মাথা নোয়াল জ্যাসন।'

'আমিও বাসতাম। কিন্তু কিচ্ছু করতে পারলাম না তার জন্যে। আমি আর টারগাস কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছোঁ মেরে টারজানকে তুলে নিয়ে গেল টিপডার।'

'টারগাস কে?'

'এক সাগোট, রোমশ বনমানুষ। টারজানের সঙ্গে এসেছিল বন থেকে।'

'টারগাস এখন কোথায়?'

'বনে চলে গেছে। টারজান নেই। সে আর থেকে কি করবে? আমিও চলে এসেছি আমার পথে।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'জোরামে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে জেনা ওখানেই গেছে। কিন্তু সঙ্গে তো নেই দেখতে পাচ্ছি। কোথায় গেল সে? জোরামে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল জ্যাসন। 'খাদের তলায় নামতে দেখলাম ওকে। আমিও পিছু নিলাম। কোথায় জানি গায়েব হয়ে গেল হঠাৎ। এই সময় বৃষ্টি নামল। স্রোত ভাসিয়ে আনল আমাকে। আর দেখিনি জেনাকে।'

চুপ করে জ্যাসনের দিকে চেয়ে কি ভাবল টোয়ার। শেষে বলল, 'যদি মিথ্যে বলে থাকো, যদি কখনও জানি তুমি তাকে মেরে ফেলেছ, কিংবা তার কোন ক্ষতি করেছ, তোমাকে খুন করব আমি।'

'আমি মিথ্যে বলছি না।'

'বেশ,' বলল টোয়ার। 'তাহলে চলো আমার সঙ্গে। কোথায় তাকে শেষ দেখেছ, আমাকে দেখিয়ে দেবে। ওখানে খুঁজব আমরা জেনাকে। কি, যাবে?'

'নিশ্চয়। আমিও তো তাকেই খুঁজছি।'

'কেন?'

থতমত খেয়ে গেল জ্যাসন। কিছু বলতে পারল না চুপ করে রইল।

কি বুঝল টোয়ার, সে-ই জানে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে আর চাপাচাপি করল না

ঝলসানো মুরগীটাকে খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর চলল জেনাকে খুঁজতে।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলেছে জ্যাসন আর টোয়ার।

সেই পাহাড়ী খাদটার ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই জেনার পায়ের ছাপ দেখা গেল। জ্যাসন যেদিকে গেছে, তার উল্টো দিকে। ছাপ অনুসরণ করে ওরা এগোল আবার।

চলতে চলতে পাহাড়ের উল্টো পাশে বেরিয়ে এল ওরা। নিচে জলাভূমি আর বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। ওপারে জঙ্গল।

'ফেলিদের দেশ!' চিন্তিত দেখাচ্ছে টোয়ারকে। 'ওদের হাতে পড়লে সর্বনাশ!'

'ওখান থেকেই উদ্ধার করে আনব জেনাকে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জ্যাসন।

'অত সোজা না। পথে অনেক বিপদ। জলাভূমিতে ভয়ানক সব জানোয়ারের বাস। আর আছে সাপ। একেকটা এত বড়, হাতি ধরে গিলে ফেলে। ওসব পেরিয়ে যেতে হবে ফেলিদের দেশে।'

'ফেলিরা যদি যেতে পারে, আমরাও পারব।'

জ্যাসনের ওপর শ্রদ্ধা বাড়ছে টোয়ারের। 'আমার বোন, আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি যাবে কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না। আমি যাবই। যত বিপদই থাক পথে, আমাকে

যেতেই হবে।'

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল টোয়ারের ঠোঁটে। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে সে, কেন জেনার জন্যে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে জ্যাসন! মাথা কাত করল, 'বেশ, চলো তাহলে।'

নিরাপদেই প্রান্তর পেরিয়ে এল ওরা। চারপাশে তাকাচ্ছে জ্যাসন। এত সব জন্তু-জানোয়ারের কথা বলল টোয়ার, কিন্তু কোথায় ওগুলো? তবে কি তাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিল?

জ্যাসনের মনের কথা যেন পড়তে পেরে বলল টোয়ার, 'এমন তাজ্জব কাণ্ড আর কখনও দেখিনি! কোন কারণে পালিয়েছে জন্তু-জানোয়ারের দল। নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। মাঠে খাবার নেই, জলাভূমির সাপখোপগুলোও বেরোচ্ছে না।'

'কিসের ভয়ে পালাল?'

'বুঝতে পারছি না!' মাথা চুলকে বলল টোয়ার।

বনে এসে ঢুকল ওরা। খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই। অবাক হয়ে জ্যাসন দেখল, বনের ভেতরে ছোট ছোট কুঁড়ে। কাঠ দিয়ে তৈরি। আমেরিকার একটা বিশেষ অঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল তার। এক সময় ওখানে এরকম বাড়ি বানাত মানুষ। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক এই বনে তেমন মানুষ এল কোথা থেকে!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। টোয়ার অস্বস্তি বোধ করছে। শক্ত করে চেপে ধরেছে বল্লমটা। জ্যাসনের হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার।

দু'জনের কেউই জানল না, গাছের আড়াল থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে অনেকগুলো জ্বলন্ত চোখ।

তেরো

অন্ধকার সুড়ঙ্গে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। জেনা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। টারজানের চোখ অন্যরকম, অন্ধকারেও দেখতে পায় সে। তবে এই সুড়ঙ্গ এত বেশি অন্ধকার, সে-ও ভালমত দেখতে পাচ্ছে না, এগোতে পারছে কেবল কোনমতে। জেনার একটা হাত ধরে রেখেছে টারজান।

শিগগিরই আলো দেখা গেল। বাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। ফোকর দিয়ে আলো আসছে। নিরাপদেই বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে।

গ্র্যানিটের পাহাড়, ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ভীষণ রুক্ষ আর এবড়োখেবড়ো, এখানে ওখানে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে খোঁচাখোঁচা পাথর। ওগুলোর মাঝ দিয়েই কোনমতে পথ করে নিয়ে নেমে চলল ওরা।

উপত্যকায় এসে নামল দু'জনে। মোড় নিয়ে এগোল। অনেকখানি ঘুরে

এসে আরেকটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়াল। পেছনে পাহাড়, সামনে পাহাড়, আশেপাশে পাহাড়। কোন্‌দিকে যাবে? সামনের পাহাড় বেয়ে ওঠাই স্থির করল টারজান।

উঠতে লাগল জেনাকে নিয়ে।

পাহাড়ের মাথায় চড়ল দু'জনে। নিচে বিশাল তৃণভূমি। লম্বা লম্বা ঘাস দুলছে বাতাসে।

'এবার কোন্‌দিকে যাব? জোরাম কোথায়?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

'আমার মনে হয় মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে,' আঙুল তুলে দেখাল জেনা। 'ওই যে ওই পাহাড়টা, ওটাই জোরাম।'

'চলো মাঠ পেরোই।'

ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা। এগিয়ে চলল লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে।

প্রান্তরের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছে। হঠাৎ বিটকেলে একটা গন্ধ নাকে এল টারজানের। থমকে দাঁড়াল সে। যেদিক থেকে আসছে গন্ধটা, সেদিকে তাকাল। খানিক পরেই দেখা গেল ঘাসের ওপর সাপের গলার মত লম্বা একটা গলা, মাথাটাও অনেকটা সাপের মত।

'গিওর!' ফিসফিস করে বলল জেনা। 'ঘাস খায়। কিন্তু মানুষ দেখলে আক্রমণ করে। খায় না, মেরে ফেলে।'

পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। এদিকেই চেয়ে আছে গিওরটা। বোধহয় মানুষের গন্ধ পেয়েছে বিশালদেহী দানব। ডিপ্লডোকাস জাতীয় কোন ডাইনোসর—ভাবল টারজান।

হঠাৎ এক পাশে মাথা ফেরাল গিওর। সতর্ক হয়ে উঠেছে কোন কারণে। পর মুহূর্তেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল সম্মিলিত কণ্ঠে, বিচ্ছিরি শব্দ। ঘাসের ওপর এক সঙ্গে দেখা দিল অনেকগুলো কুৎসিত মাথা।

'হরিব!' আতঙ্কে কেঁপে উঠল জেনা।

কিছু বলল না টারজান, তাজ্জব হয়ে চেয়ে আছে জীবগুলোর দিকে। হাতে ছোট ছোট বল্লম। ওই অস্ত্র নিয়ে গিওরের মত এতবড় দানবকে আক্রমণ করবে!

নেতার আদেশে গোল হয়ে গিওরকে ঘিরে ফেলল হরিবরা, বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিত পেতেই ছুটল এক সঙ্গে। ছোট করে আনল বৃত্ত। জীবটার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গিয়ে বল্লম ছুঁড়ল। এক সঙ্গে অনেকগুলো বল্লম গেঁথে গেল গিওরের শরীরে এখানে ওখানে। দুটো বল্লম বিঁধল দুই চোখে, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল খুদে মাথাটা। পাল্টা আঘাত হানার সামান্য সুযোগও পেল না বিশালদেহী ডাইনোসর। চাপা একটা চিৎকার করেই পড়ে গেল।

হরিবদের যুদ্ধকৌশল দেখে অবাক হয়ে গেল টারজান। ব্যবহার করতে জানলে খাটো বল্লম দিয়েই অনেক কিছু করা যায়, চোখের সামনেই দেখতে পেল।

ঘাসের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে টারজান আর জেনা। এতক্ষণ যুদ্ধের উত্তেজনায় ওদেরকে দেখতে পায়নি হরিবরা। এখন চোখে পড়ে গেল। চিৎকার করে ছুটে আসতে লাগল ওরা।

টারজানের হাত খামচে ধরল জেনা। 'টারজান! এখন কি করব।'

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব,' শান্তকণ্ঠে বলল টারজান। 'লড়াই করে ফায়দা হবে না। দেখাই যাক, কি করে ওরা। না-ও মারতে পারে।'

চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল হরিবরা। এগিয়ে আসছে এখন ধীরে ধীরে। বল্লম ছোঁড়ার কোন লক্ষণ নেই। সংখ্যায় ওরা অনেক, অন্তত পঞ্চাশজন হবে। মাত্র দু'জনের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন দরকারই মনে করছে না ওরা।

আরও কাছে এসে গেছে হরিবরা। কাছে আসায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। মুখটা সাপের মত লম্বাটে। চোখা কান। মাথায় ছোট ছোট দুটো করে শিং। হাতের আঙুল তিনটে করে। সারা শরীর মাছের মত আঁশে ঢাকা। বীভৎস দেখতে। মানুষের মতই দুটো হাত, দুটো পা, সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথা বড়, তার মানে বুদ্ধিও আছে যথেষ্ট।

কোন্ জাতের জীব ওরা!—ভাবছে টারজান। মানুষ আর সরীসৃপের মিশ্রণ? প্রাগৈতিহাসিক উভচর কোন স্তন্যপায়ী? ওদের নাম জানেন না বিজ্ঞানীরা, কোন কঙ্কালও পাওয়া যায়নি বাইরের পৃথিবীতে।

বৃত্তটা অনেক ছোট করে আনল হরিবরা। এবার কি করবে? বল্লম ছুঁড়বে? বুঝতে পারছে না টারজান।

চেঁচিয়ে উঠল হবিরদের নেতা, সাগোট আর গিলাকদের ভাষার মিশ্রণ। 'পালাতে পারবে না তোমরা। আত্মসমর্পণ করো।'

চোদ্দ

অবাক হয়ে বাড়িঘরগুলো দেখছে জ্যাসন।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?' বলল টোয়ার। 'চলো এগোই।'

আরও কয়েক পা এগোল দু'জনে। দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকগুলো মানুষ। ঘিরে ফেলা হয়েছে তাদেরকে।

এখানকার প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে রোমশ গণ্ডার, হাতি, টেরানোডন, ডাইনোসর দেখে যতখানি অবাক হয়েছে জ্যাসন, তারচেয়ে বেশি অবাক হলো মানুষগুলোকে দেখে। আধুনিক মানুষ, পোশাকে-আশাকে জলদস্যু বলেই মনে হয়। হাতে আদিম বন্দুক। মাঠের জন্তু-জানোয়ারগুলো কেন পালিয়েছে, বোঝা গেল এখন।

'কে তোমরা?' ইংরেজিতে কথা বলে উঠল একজন।

'আমি জ্যাসন গ্রিডলে, আমেরিকা থেকে এসেছি।' টোয়ারের দিকে

ফিরল জ্যাসন। 'এরাই কি ফেলি?'

'না। আজই প্রথম দেখলাম। নামও শুনিনি এদের,' বলল টোয়ার।

'চুপ!' ধমকে উঠল লোকটা। চেহারা আর আচার-আচরণে মনে হচ্ছে সে জলদস্যুদের সর্দার। 'তোমরা কে বুঝতে পারছি, বিশেষ করে তুমি,' জ্যাসনকে বলল। 'নিশ্চয় সারি থেকে এসেছ, রিভলভারই প্রমাণ করে দিচ্ছে সেটা। কেন এসেছ? কোরসারদের দেশে ফেউগিরি করতে? চলো, সিড আর বুলফ খুব খুশি হবে তোমাদেরকে দেখলে। ছাল তুলে লবণ মাখিয়ে দেবে।' দলের একজনের দিকে ফিরল সর্দার। 'কোরসারে যখন বন্দী ছিলে, এ ব্যাটাকে দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল লোকটা।

'হুঁম্!' চিন্তিত দেখাল সর্দারকে। 'চলো, জাহাজে নিয়ে চলো ব্যাটাদের। গোটা কয়েক রদ্দা লাগালেই সুড়সুড় করে কথা বেরোবে পেট থেকে।'

জ্যাসন আর টোয়ারকে চারপাশ থেকে ঘিরে নিয়ে এগোল কোরসাররা। শিগগিরই বেরিয়ে এল বনের বাইরে সাগরতীরে।

এই প্রথম পেলুসিডারের সাগর দেখল জ্যাসন। ভূ-পৃষ্ঠের সাগরের মত নীল নয়, ধূসর।

লম্বা ছিপ জাতীয় একটা নৌকায় বসে আছে পাঁচজন কোরসার। দলটাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

বন্দীদের নৌকায় তোলা হলো। ছেড়ে দেয়া হলো নৌকা। একটা কথা ভেবে অবাক হয়েছিল জ্যাসন, তাদেরকে বাঁধা হয়নি কেন? এখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সাগরে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। ডাঙার জীবের চেয়ে কোন অংশে কম নয় ওগুলো হিংস্রতায়, কোন কোনটা বরং বেশি। কুমিরের মত কয়েকটা বিশাল সরীসৃপ বার বার নৌকা উল্টে দেয়ার চেষ্টা করছে। কখনও বৈঠা দিয়ে বাড়ি মেরে, কখনও প্রাচীন গাদা বন্দুক ব্যবহার করে ওদেরকে ঠেকাচ্ছে কোরসাররা।

মাইলখানেক গিয়ে মোড় নিল নৌকা। সাগর থেকে বন চিরে ঢুকে গেছে একটা প্রণালী, কিংবা হয়তো কোন পাহাড় থেকে সাগরে এসে মিশেছে ওটা। নদী না কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পানির রঙে কোন তফাত নেই।

প্রণালী কিংবা নদী যা-ই হোক, ওতে ঢুকে পড়ল নৌকাটা। জলজ প্রাণীর কমতি নেই এখানেও। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পালানোর কোন আশাই নেই—ভাবল জ্যাসন। চুপচাপ বসে আছে সে।

নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা করছে কোরসাররা। ওদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সর্দারের নাম লাজো।

পাল্টে যাচ্ছে নদীর দুই তীরের প্রকৃতি। বন পাতলা হতে হতে শেষ হয়ে এল এক সময়। সামনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি।

খানিকটা এগোতেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল কোরসাররা। বার বার তাকাচ্ছে ঘাসবনের দিকে, চোখে মুখে অস্বস্তির ছাপ। কোন কারণে ভয় পাচ্ছে ওরা।

আরও কয়েক মাইল এগোল নৌকা। বসে থেকে থেকে একটু ঝিমুনি মত এসেছে জ্যাসনের। হঠাৎ চমকে চোখ মেলল তীক্ষ্ণ চিৎকারে, 'ব্যাটারা ওখানেই আছে!'

চেঁচিয়ে উঠেছে এক কোরসার। আঙুল তুলে তৃণভূমির একটা দিকে দেখাচ্ছে।

লাজো চেঁচিয়ে আদেশ দিল, 'আরও জোরে! আরও জোরে দাঁড় টানো!'

একসঙ্গে অনেক দাঁড় টানার ছপ-ছপাৎ শব্দ উঠল। তীরের মত ছুটে চলল নৌকা পানি কেটে।

'ওই...ওই যে ব্যাটারা!' চেঁচিয়ে উঠল আরেক কোরসার।

ফিরে চেয়ে দেখল জ্যাসন, ঘাসবন থেকে বেরিয়ে নদীতে নামছে অনেকগুলো কুৎসিত জীব। এক ধরনের সরীসৃপ। পিঠে বসে আছে আরও কুৎসিত কতগুলো হাত-পাওয়ালা জীব, হাতে বল্লম। পানিতে নেমে তরতর করে সাঁতরে আসছে সরীসৃপগুলো। দ্রুত গতি। নৌকা পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

'হরিব!' এতক্ষণে কথা বলল টোয়ার। আতঙ্কিত। 'হরিবরা আসছে। আর রেহাই নেই!'

হু-হু করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। কিন্তু তার চেয়েও অনেক দ্রুত ছুটে আসছে হরিবদের অদ্ভুত বাহন। ধরে ধরে অবস্থা।

গুলি চালানোর আদেশ দিল লাজো।

গর্জে উঠল গাদা বন্দুক। পড়ে গেল কয়েকটা হরিব। থমকে গেল তাদের সরীসৃপ-বাহন। এক মুহূর্ত। তারপর আরও দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল অন্য হরিবরা।

দেখতে দেখতে কোরসারদের নৌকা ঘিরে ফেলল হরিবরা। হাতের বল্লম তুলে ধরেছে, কিন্তু ছুঁড়ছে না। বোধহয় জ্যান্ত পাকড়াও করতে চায় মানুষদেরকে।

গাদা বন্দুক নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না কোরসাররা। সরীসৃপগুলো এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে নৌকা উল্টে দিল। পানিতে পড়ে সাঁতরে পালানোর চেষ্টা চালাল কোরসাররা। পারল না। কেউ কেউ বেশি দাপাদাপি করায় হরিবদের বল্লমের খোঁচায় মরল। অন্যরা বন্দী হলো।

মানুষদেরকে ডাঙায় তুলে আনল হরিবরা। লাশগুলোকেও ফেলে এল না, নিয়ে এল সঙ্গে করে। নদীর তীরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল জীবিতদেরকে। লাশগুলোকে টেনে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘিরে বসল।

'আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?' লাজোর দিকে চেয়ে বলল জ্যাসন।

'জানি না!' মাথা নাড়ল লাজো।

'ওদের বাচ্চাকাচ্চাকে খাওয়াবে,' বলল টোয়ার।

শিউরে উঠল জ্যাসন। হরিবদের দিকে চেয়ে আত্মা কেঁপে উঠল আরও।

লাশগুলোকে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে রাক্ষসগুলো। আর কি আনন্দ।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে তাজ্জব হয়ে গেল জ্যাসন। এতক্ষণ দেখেছে হরিবদের গলা আর বুক নীলচে, এখন লাল হয়ে যাচ্ছে। যতই খাচ্ছে, গাঢ় হচ্ছে রঙ, টকটকে লাল হয়ে উঠেছে কারও কারও।

পেট ভরে খেয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল হরিবরা। ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

পানিতে ডুবসাঁতার কাটছে আজব বাহনগুলো। ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ খাচ্ছে। একে অন্যকে তাড়া করে খেলছে। কিন্তু মনিবদের কাছ থেকে বেশি দূরে যাচ্ছে না। জীবগুলোকে ব্র্যাকিওসরাস কিংবা প্ল্যাটোসরাসের খুদে সংস্করণ বলে মনে হলো জ্যাসনের।

'ওগুলো গোরোবর,' সরীসৃপগুলোকে দেখিয়ে বলল টোয়ার। মাথার ওপরে অনন্ত সূর্য। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর ভয়ে কাহিল জ্যাসন। এত বিপদের মাঝেও ঢুলতে শুরু করল সে।

পিঠে খোঁচা খেয়ে তন্দ্রা ছুটে গেল জ্যাসনের। দেখল, হরিবদের ঘুম ভেঙেছে। একজন খোঁচা মেরেছে তার পিঠে।

'ওঠো,' বলল হরিবটা। ভাষা জোরামের মত অনেকটা, বুঝতে পারছে তাই জ্যাসন। 'পালানোর চেষ্টা করলেই মরবে।'

বাঁধন খুলে দেয়া হলো বন্দীদের। ডাক দিয়ে পানি থেকে গোরোবরগুলোকে তুলে আনল হরিবরা।

বন্দীদেরকে বাহনের পিঠে তুলে নেয়া হলো। কুৎসিত জীবগুলোর পিচ্ছিল পিঠে বসে গা ঘিনঘিন করছে জ্যাসনের।

লম্বা ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। প্রান্তর পেরিয়ে ঢুকল বনে। ঘন বন। সূর্যের আলো তেমন ঢুকতে পারে না। ছায়া ছায়া অন্ধকার।

গোরোবরের পিঠে বসে আছে জ্যাসন। পেছনে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে একটা হরিব। জিজ্ঞেস করল জ্যাসন, 'আমাদেরকে নিয়ে কি করবে?'

'খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা করব। তারপর কেটে খাওয়াব ছেলেমেয়েদের। মাছ আর গিওরের গোস্ত খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে ওরা। গিলাক পেলে খুশি হবে।'

চুপ করে গেল জ্যাসন। ছাগল কিংবা শুয়োর যেন তারা। খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা করে কেটে খাওয়াবে, ভাবতেই কেমন লাগছে।

বন পেরিয়ে এল দলটা। সামনে বড় একটা হ্রদ। কাচের মত স্বচ্ছ পানি, চিকচিক করছে লাল সূর্যের আলোয়। আরও অনেকগুলো হরিব সাঁতার কাটছে পানিতে। মেয়ে-হরিব আর বাচ্চাকাচ্চাই বেশি। দলটাকে দেখে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল ওরা।

হ্রদের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ, থকথকে কাদা। মাটি বা গাছপালা কিচ্ছু নেই। ওখানেই গোরোবরের পিঠ থেকে নামানো হলো বন্দীদের।

প্রথমে টোয়ারকে ধরল ওরা। দু'জন হরিব দু'দিক থেকে চেপে ধরল ওকে। একজন একটা হাত দিয়ে নাক চেপে ধরল টোয়ারের। তারপর তাকে

নিয়ে দু'জনে একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল পানিতে। স্বচ্ছ পানিতে দ্রুত সাঁতরে ডুবে যাচ্ছে তলায়।

আরে, এ কি! চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে জ্যাসন। তাদেরকে না কেটে খাওয়ানোর কথা! পানিতে চুবিয়ে মারছে কেন তাহলে?

টোয়ার অদৃশ্য হতে না হতেই আরও দু'জন হরিব চেপে ধরল জ্যাসনকে। টোয়ারকে যেভাবে নিয়েছে, তাকেও একই রকম ভাবে টেনে নিয়ে ঝাঁপ দিল পানিতে।

দ্রুত জ্যাসনকে নিয়ে তলায় নেমে যাচ্ছে দুটো হরিব। কেন কি করছে ব্যাটারা, কিছুই বুঝতে পারছে না জ্যাসন। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে তার ফুসফুস।

আর পারছে না জ্যাসন, এই সময় নাক ছেড়ে দেয়া হলো তার। নাকে ঢুকল বিশুদ্ধ বাতাস। বুক ভরে টেনে নিয়ে তাকাল সে চারপাশে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার। টের পাচ্ছে, আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে অসংখ্য জীব। কিলবিল করে কোন কোনটা এসে উঠছে গায়ের ওপর। ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু লাভ কি? একটা ফেললে দশটা এসে ওঠে।

বাঁচার আর কোন আশা নেই। পানির তলায় এই ঘন কালো অন্ধকারে কখন এসে হানা দেবে মৃত্যু, কে জানে! ধপ করে ঠাণ্ডা কাদামাটির ওপরেই বসে পড়ল জ্যাসন।

পনেরো

গোরোবরের পিঠে বসিয়ে টারজান আর জেনাকে নিয়ে এগোচ্ছে হরিবদের আরেকটা দল। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে বনের দিকে।

পাশাপাশি এগোচ্ছে দুটো গোরোবর, একটাতে টারজান, অন্যটাতে জেনা। হরিবরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে জানে না। তবে এটুকু বুঝে গেছে, আপাতত মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে নেই ব্যাটাদের।

বনে ঢুকে পড়ল দলটা। শুরুতে গাছপালা পাতলা, আস্তে আস্তে ঘন হতে শুরু করল।

টারজান ইচ্ছে করলে পালাতে পারে এখন। লাফ দিয়ে কোন একটা গাছের ডাল ধরে উঠে গেলে হরিবদের সাধ্য নেই তাকে ঠেকায়। কিন্তু সমস্যা জেনাকে নিয়ে। ওকে বাঁচাবে কেমন করে? সুযোগের অপেক্ষায় রইল সে।

এগিয়ে যাচ্ছে বিচিত্র দলটা। বনের ভেতরে গতি দ্রুত করতে পারছে না গোরোবরেরা। বার বার জেনার দিকে তাকাচ্ছে টারজান। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে, সে পালাতে যাচ্ছে। কিন্তু সুযোগই পেল না। সতর্ক নজর রেখেছে

হরিবরা।

আরও অনেকখানি এগোনোর পর পানির গন্ধ এল টারজানের নাকে। সামনে নিশ্চয় নদী কিংবা সাগর। আর দেরি করা যায় না। বনে থাকতে থাকতেই পালাতে হবে। খোলা জায়গায় বেরোলে সুযোগ মিলবে কিনা কে জানে! সে আগে পালাতে পারলে যে করেই হোক জেনাকে বাঁচানোর একটা উপায় হয়ে যাবে। মনে মনে তৈরি হলো টারজান।

সামনে একটা মোটা ডাল। ওটা মাথার ওপর এসে যেতেই লাফ দিল টারজান। হরিবরা কিছু করার আগেই উঠে গেল ওপরে, লাফ দিয়ে চলে গেল আরেকটা গাছে।

চেঁচিয়ে উঠল হরিবরা। তাড়াহুড়া করে গাছে উঠে পড়ল কয়েকজন। তাড়া করে গেল টারজানকে। রাগে তাদের নীলচে আঁশ ঘন নীল হয়ে গেছে।

টারজানের সঙ্গে বানরই পারে না, আর হরিবরা পারবে। চোখের পলকে তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল সে। হারিয়ে গেল ঘন পাতার আড়ালে।

*

'জ্যাসন! জ্যাসন গ্রিডলে!'

অন্ধকারে ডাকটা কানে যেতেই চমকে উঠল জ্যাসন। টোয়ার। তাকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই জায়গায়। আরও লোকের সাড়া পাওয়া গেল। একজনের গলা চেনা গেল, লাজো। সব বন্দীকে একই জায়গায় এনে ভরেছে হরিবরা।

'বলো, টোয়ার,' সাড়া দিল জ্যাসন।

'কোথায় রয়েছি আমরা?' কথা বলল লাজোর দলের একজন।

'কি জানি!' বলল আরেকজন।

'এই অন্ধকারে এখানে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল,' বলল তৃতীয় আরেকজন।

'পানির তলায় কোন গুহাতে নিয়ে এসেছে আমাদেরকে ব্যাটারা,' বলল লাজো। 'কুমিররাই এ রকম গুহায় বাসা বাঁধে। ওই ব্যাটারা কুমিরের বাড়া।'

খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর জ্যাসন বলল, 'কাছে এসে বসো সবাই। এ ভাবে চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে নেই। বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

'কি করে? হাতড়ে হাতড়ে গুহামুখ নাহয় পেলামই, কিন্তু পানির ওপর ভেসে উঠলেই আবার ক্যাক করে চেপে ধরবে রাক্ষসগুলো। যা গায়ের জোর! পারব না ওগুলোর সঙ্গে,' বলল এক কোরসার।

'সে তখন দেখা যাবে,' বলল জ্যাসন, 'আগে তো বেরোই। এসো, কাছে এসো, সবাই।'

কাছে এসে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল সবাই।

'হরিব ব্যাটাদের কেউ নেই তো এখানে?' প্রশ্ন করল জ্যাসন।

'জানি না। বোঝার উপায় নেই,' জবাব দিল লাজো। 'থাকলে চুপচাপ আমাদের কথা শুনবে দূরে থেকে। গা ঘেঁষে আসবে না।'

'আস্তে কথা বলো,' বলল জ্যাসন। 'তাহলেও হয়তো শুনে ফেলবে। একটা ভরসা, ইংরেজি হয়ত বুঝবে না।'

'কি করে বেরোবে, ভেবেছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল টোয়ার। 'যে পথে এসেছি সেদিক দিয়ে বেরোনো যাবে না কিছুতেই। আবার ধরে ফেলবে ব্যাটারা।'

'তাহলে কি করে বেরোবে?' লাজোর প্রশ্ন।

'এক কাজ করা যাক,' বলল জ্যাসন। 'গুহার মুখটা কোন দিকে আছে জেনে নিই আগে। তারপর উল্টো দিকে বেরোনোর চেষ্টা করব।'

'কি করে?'

'তোমাদের ছুরিগুলো আছে?'

কোমরে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল সবাই, 'আছে।'

বন্দীদেরকে নিয়ে এতই নিশ্চিন্ত হরিবরা, ছুরিগুলোও কেড়ে নেয়ার কথা ভাবেনি। জ্যাসন বলল, 'ছুরি দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বনের তলায় চলে যাব আমরা। সুড়ঙ্গ করে বেরিয়ে যাব। ধরতে পারবে না ব্যাটারা।'

'তা পারবে না,' লাজোর গলায় সন্দেহ। 'তবে এত বড় সুড়ঙ্গ শুধু ছুরি দিয়ে খুঁড়তে পারব তো?'

'পারতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জ্যাসন। 'মাটি খুব নরম। আমার তো মনে হয়, পারব। এসো, দেরি না করে কাজে লেগে যাই।'

কাজে লেগে গেল ওরা। হাতড়ে হাতড়ে বের করল গুহামুখটা, পানিতে ডুবে আছে। তাদেরকে ওপরের শুকনো তাকমত জায়গায় রেখে গিয়েছিল হরিবরা। জায়গাটা নিশ্চয় হ্রদের পানির সমতলের ওপরে, তাই পানি ওখানে উঠছে না। সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গেলে এখান থেকেই শুরু করতে হবে। তাহলে হ্রদের পানি ঢুকবে না।

একজন পাহারা রইল গুহামুখে। অন্যেরা কাজ শুরু করে দিল। যে ভাবেই হোক, বেরোতে হবে এখান থেকে। হরিবের বাচ্চার খাবার হতে চায় না একজনও।

*

পাতার আড়াল থেকে দেখল টারজান, গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে হরিবরা। জেনার কাছে গিয়ে কড়া গলায় কি বলল। জবাব দিল না মেয়েটা।

আবার চলতে শুরু করল হরিবের দল।

পিছে পিছে এগোল কিছুক্ষণ টারজান। মোড় নিয়েছে দলটা। সরাসরি বেরোবে না বন থেকে। যতই এগোচ্ছে, বাড়ছে পানির গন্ধ। আগে আগে ছুটল টারজান। কোন দিক দিয়ে বেরোবে হরিবরা, আগেভাগেই দেখে রাখতে চায়। জায়গা চেনা না থাকলে উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

খানিকটা পিছিয়ে এল টারজান। মোড় নিয়ে আরেক পাশ ধরে এগোল।

হঠাৎ পাশ থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে লাগল নাকে। চমকে উঠল টারজান। অতি পরিচিত গন্ধ। মোড় নিয়েই ছুটল সে। গন্ধের উৎস কোথায়,

দেখতে হবে।

শিগগিরই দলটাকে দেখতে পেল টারজান। ঝুপ করে নেমে এল গাছ থেকে ওদের সামনে।

টারজানকে দেখে চমকে উঠল কালোরা। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে সম্মান জানাল।

'বাওয়ানা!···বাওয়ানা!···আপনি বেঁচে আছেন!' চেঁচিয়ে উঠল কালোদের সর্দার।

'হ্যাঁ, মুভিরো। সব কথা পরে বলব। আগে একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে। তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে হরিবরা,' বলল টারজান।

'হরিব!'

'মানুষের মত অথচ মানুষ নয়। শরীরের অনেক জায়গা সাপের মত, কিন্তু সাপও নয়। এক অদ্ভুত জীব। খুব পাজি! চলো, জলদি চলো। রাইফেল ঠিক আছে তো তোমাদের?'

'হ্যাঁ, বাওয়ানা।'

'এসো তাহলে।'

আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটল টারজান। পাশে মুভিরো। পেছনে অন্যেরা। গোরোবরদের ধরে ফেলতে হবে শিগগির।

ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে, বেরিয়ে এল ওরা। একটা দিক দেখিয়ে টারজান বলল, 'ওদিক দিয়ে বেরোবে ওরা যা মনে হয়। এসো, লুকিয়ে পড়ি। হঠাৎ আক্রমণ করব।'

গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সবাই। পাশাপাশি বসল টারজান আর মুভিরো।

'মুভিরো, ও-টু টোয়েন্টি কোথায় আছে জানো?' জিজ্ঞেস করল টারজান। দৃষ্টি তার বনের প্রান্তের দিকে।

'না, বাওয়ানা।'

'তোমরা বেরিয়েছিলে কেন?'

'আপনাকে খুঁজতে। বাওয়ানা জ্যাসন আর ফন হোর্স্টও ছিলেন সঙ্গে।'

'ছিলেন মানে? কোথায় তারা?'

'জানি না। হাতি আর বাঘের তাড়া খেয়ে দৌড় দিয়েছিলাম। বাওয়ানা জ্যাসন বোধ হয় একটা গাছে উঠে পড়েছিলেন। বাওয়ানা হোর্স্ট আমাদেরকে নিয়ে বনে ঢুকে পড়লেন। তারপর কয়েকদিন একনাগাড়ে হেঁটেছি। প্লেনটাকে পাইনি। একদিন গুহায় ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে বাওয়ানা হোর্স্টকে দেখলাম না কোথাও···ওই যে, আসছে!···ইস্, কি বিচ্ছিরি চেহারা!'

চুপ করার নির্দেশ দিল সবাইকে টারজান। রাইফেল তুলে তৈরি হতে বলল। নিজে নিয়েছে তীর-ধনুক।

এগিয়ে এল হরিবরা। এক সঙ্গে গর্জে উঠল দশটা রাইফেল। টংকার উঠল ধনুকে। প্রায় একই সঙ্গে গোরোবরের পিঠ থেকে পড়ে গেল এগোরোটা

হরিব। অন্যেরা বিমূঢ় হয়ে গেল কাণ্ড দেখে।

আবার গর্জে উঠল রাইফেল। পড়ে গেল আরও এগারোটা হরিব। রাইফেলের গর্জনে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক পালানোর চেষ্টা করছে গোরোবরগুলো। তাদেরকে সামলাতে ব্যস্ত হরিবরা। এরই মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে গুলি। ঝাঁকে ঝাঁকেই মরছে ওরা। গুলি খাচ্ছে গোরোবররাও, আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। পাল্টা আঘাত হানা তো দূরের কথা, পালানোর পথ পাচ্ছে না হরিবরা আধুনিক অস্ত্রের মুখে পড়ে।

হুড়াহুড়ির মাঝে জেনাকে খুঁজছে টারজান। তাকে দেখতে পেল একটা গোরোবরের পিঠে। পেছনে বসে আছে এক হরিব। তীর ছুঁড়ল টারজান। পড়ে গেল হরিবটা। কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটে গেল গোরোবরটার। ভয় পেয়ে ছুটল ওটা নদীর ধার ধরে।

লাফিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল টারজান। একটা সওয়ারহীন গোরোববের পিঠে চড়ে বসল লাফ দিয়ে। ছোটাল সেটাকে জেনার পেছনে।

উড়ে চলেছে যেন সামনের গোরোবরটা, লাফিয়ে লাফিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে। পড়ে যাওয়ার ভয়ে ওটার গলা আঁকড়ে ধরে আছে জেনা।

জোরে, আরও জোরে গোরোবর ছোটাল টারজান। সামনেরটাকে ধরে ধরে প্রায়। গোরোবরের পিঠে থেকেই তীর ছুঁড়ল সে। সামনের গোরোবরের মাথার ঠিক নিচে বিঁধে গেল তীর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জীবটা। ছিটকে মাটিতে পড়ল জেনা।

গোরোবর থামাল টারজান। লাফিয়ে পিঠ থেকে নেমে ছুটল জেনার দিকে। নদীর তীরে নরম মাটি। টারজানের পায়ের চাপে বসে গেল হঠাৎ। প্রায় দেড়-দুই হাত দেবে গেল পা। পরমুহূর্তেই তার পা ধরে নিচ থেকে কে যেন দিল এক হ্যাঁচকা টান!

ষোলো

অনির্দিষ্ট ভাবে আকাশে উড়ছে-২২০। নিচে গিওর প্রান্তর। ছোটবড় অনেক ডাইনোসর চরছে মাঠে, বিমানের শব্দে ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করল ওগুলো।

'কি ওগুলো?' জানতে চাইল রবার্ট জোনস।

'অতি নিরীহ কিছু পাণী,' ঠাট্টা করে বলল হাইন্স।

আরেকটা কি বলতে যাচ্ছিল জোনস, বাধা দিল টেলিফোন।

লেফটেন্যান্ট ডর্ফ। পর্যবেক্ষণ কামরা থেকে খবর পাঠিয়েছে, দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

হাইন্স ছুটে গেল জানালার ধারে।

সাগরের তীর ধরে উড়ছে এখন ও-২২০। সৈকতের গা ঘেঁষে আছে বন। বনের ধারে ছোট ছোট হরিণ জাতীয় কিছু প্রাণী দেখা যাচ্ছে।

'অনেকক্ষণ তো উড়লাম,' বলল হাইন্স। 'এবার নামা দরকার। শিকার মিলবে এখানে। তাজা মাংস খাওয়া যাবে।'

রাজি হলো বিমানের সবাই। নামতে শুরু করল বিমান।

রবার্ট জোনস তার ডায়েরীতে লিখল: দুপুর বেলা সাগর তীরে নামলাম আমরা।

*

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে মাটি খামচে ধরল টারজান। পতন রোধ করল। নিচে থেকে টানছে কেউ, হাতই মনে হচ্ছে। এ আবার কি জানোয়ার! যে জানোয়ারই হোক, গর্তের ভেতরে ওটার কবলে পড়া চলবে না। জোরে পা ঝাড়া দিল টারজান। দুই ঝাড়া দিয়েই মুক্ত করে নিল পা। হাতে ভর দিয়ে এক ঝটকায় তুলে আনল শরীরটাকে।

নিচে তাকানোর দরকার মনে করল না টারজান। আবার কোন্ আজব জীবের কবলে পড়বে কে জানে! এখান থেকে ভেগে যেতে চায় সে তাড়াতাড়ি। উঠে বসেছে জেনা। এদিকেই এগিয়ে আসছে। টারজানও এগোল।

জেনাকে ধরল টারজান। 'কোথাও লেগেছে নাকি?'

মাথা নাড়ল জেনা। টারজানের পেছনে চেয়ে হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'ওরা কারা!'

ফিরে তাকাল টারজান। একটু আগে যে গর্তটাতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন মানুষ। আরেকটা মাথা দেখা যাচ্ছে। বেরোচ্ছে আরেকজন। হাত ধরে টেনে তাকে উঠতে সাহায্য করছে প্রথম লোকটা।

'টোয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল জেনা। পরমুহূর্তেই ছুটল।

টারজানও চিনতে পারল টোয়ারকে। তাকে উঠতে সাহায্য করছে স্বয়ং জ্যাসন গ্রিডলে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই টারজানও ছুটল।

একে একে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল লাজো আর তার দলের অন্যেরা।

'জ্যাসন! জ্যাসন তুমি বেঁচে আছ! আমি···আমি ভেবেছিলাম তুমি···!' রুদ্ধ হয়ে এল জেনার কণ্ঠ।

'আমি ভেবেছিলাম তুমিও···' বলল জ্যাসন। 'টারজান···টারজান, তুমিও বেঁচে আছ!···জেনার দেখা পেলে কি করে?' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল সে।

টারজানকে দেখে টোয়ারও খুব খুশি।

একে অন্যের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল টোয়ার, জ্যাসন টারজান আর জেনা।

ওয়াজিরিয়া পৌঁছে গেল ইতিমধ্যে।

অনেক উত্তেজনা গেছে। খিদে লেগেছে সবারই। শিকার করার জন্যে বসে এসে ঢুকল ওরা একসঙ্গে। খাবারের অভাব নেই। বড় দেখে কয়েকটা হরিণ মেরে নিয়ে খেতে বসে গেল।

খাওয়া শেষ করে গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসল ওরা। আলাপ-আলোচনা চলল। কিভাবে, কে কার দেশে ফিরে যাবে, সেই আলোচনা।

'কোরসারে ফিরে যেতে পারতাম আমরা একটা নৌকা হলে,' বলল লাজো। 'তোমাদেরকেও নিয়ে যেতে পারতাম। তোমাদেরকে আর শত্রু ভাবি না আমরা। তোমরা ভাল লোক, বুঝেছি।'

'কিন্তু নৌকাই তো নেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আরেক কোরসার।

'টোয়ার, তুমি কি করবে?' বলল টারজান। 'জোরাম তো কাছেই। জেনাকে নিয়ে চলে যাও। নাকি সাহায্য লাগবে?'

'এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে চাই না,' বলল টোয়ার। 'তোমাদেরকে খুব ভাল লাগছে। তা ছাড়া তোমাদের এই অভিযানও আমার খুব পছন্দ। শেষ অবধি কি হয় দেখে যেতে চাই, যদি আপত্তি না করো।'

'বেশ, থাকো তাহলে,' বলল টারজান। 'তুমি থাকলে সুবিধাই হবে। এ দেশ তোমার চেনা। অনেক রকমে সাহায্য করতে পারবে।'

সবাই একমত হলো, কোরসারে যাবে। ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে এসেছে, একথা লাজোকে বলল না টারজান কিংবা জ্যাসন। ওদেরকে বলল, পেলুসিডারে ভ্রমণ করতে এসেছে আমেরিকা থেকে। এখন একটা নৌকা দরকার, তাহলেই চলে যেতে পারে সবাই কোরসারে।

নৌকা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। লাজোদের নৌকাটা উল্টে গিয়েছিল হরিবদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। ওটাই ভেসে এসে ঠেকেছে তীরে। বন থেকে বেরিয়ে দলটা নদীর তীর ধরে হাঁটার সময় পেয়ে গেল ওটা। আর কোন ভাবনা নেই। নৌকা সোজা করে নিয়ে পানি সেঁচে ফেলে উঠে বসল সবাই।

কোরসারের দিকে এগিয়ে চলল নৌকা।

সতেরো

সাগরের কূল ঘেঁষে চলেছে নৌকা।

'ওগুলো কি?' এক সময় বলল জ্যাসন। আঙুল তুলে দেখাল মাঝ-দরিয়ার দিকে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে ভাল করে দেখল লাজো। অনেক দূরে কালো কালো কয়েকটা বস্তু খুব ধীরে নড়ছে। 'জাহাজ, নৌ-বহর,' বলল সে।

সঙ্গীদেরকে জাহাজের দিকে নৌকার মুখ ঘোরানোর নির্দেশ দিল।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে নৌকা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে জাহাজগুলো। পাল-মাস্তুল দেখা যাচ্ছে।

'জাহাজগুলো কাদের?' জিজ্ঞেস করল জ্যাসন।

'কোরসারদের,' জবাব দিল লাজো।

'শত্রুদেরও তো হতে পারে।'

'এদিককার সাগরে শুধু আমাদের জাহাজই চলাচল করে।'

আরও এগোল নৌকা। স্পষ্ট হচ্ছে জাহাজগুলো। সামনের জাহাজটার দিকে চেয়ে আছে লাজো। একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'নৌকার মুখ ঘোরাও। জলদি! ওগুলো আমাদের নয়!'

নৌকার মুখ ঘোরানোর আগেই সামনের জাহাজ থেকে ভেসে এল চিৎকার। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজ। ওটার সঙ্গে পারবে না নৌকা। কাছে এসে গেল জাহাজ। ডেক থেকে চেঁচিয়ে আদেশ দিল একজন, 'থামো! নইলে কামান দাগব।'

অবাক হয়ে চেয়ে আছে নৌকার লোকেরা জাহাজটার দিকে, শুধু লাজো বাদে। ডেকে কামান দেখা যাচ্ছে।

'কোরসাররা স্প্যানিশ,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাসন। 'এখন দেখা যাচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানও আছে। পৃথিবীর সব জলদস্যু এখানে এসে আড্ডা গেড়েছে নাকিরে বাবা!'

কেউ কোন জবাব দিল না।

নৌকার গা ঘেঁষে এল জাহাজ। রেলিঙে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল জ্যাসন, 'কে তোমরা?'

'আমি আনোরকের জা। এটা সম্রাট ডেভিড ইনেসের নৌ-বহর। তোমরা কারা?'

'বন্ধু,' জবাব দিল টারজান।

'কোরসার সাগরে পেলুসিডার সম্রাটের বন্ধু থাকতে পারে না। মিথ্যে কথা বলছ।'

'এবনার পেরি কি আছে জাহাজে? তাহলে প্রমাণ করে দিতে পারব মিথ্যে বলছি না।'

'না তিনি নেই। তাঁর নাম জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল জা।

'ও জ্যাসন গ্রিডলে,' জ্যাসনকে দেখিয়ে বলল টারজান। 'এবনার পেরির কাছে হয়তো এর নাম শুনেছ। পৃথিবী থেকে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে জ্যাসন; কোরসারদের কারাগার থেকে ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে।'

'বেশ,' বলল জা, 'জাহাজে উঠে এসো। চুপচাপ।' নৌকার কোরসারদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে সে। 'তারপর বোঝা যাবে সত্যি বলছ কি মিথ্যে বলছ।'

নৌকার সবাই উঠে গেল জাহাজে। সবাইকে একটা বড় কেবিনে নিয়ে গেল জা। হোমরা-চোমরা চেহারার অনেক অফিসার বসে আছে ওখানে।

ভুরু কুঁচকে তাকাল আগন্তুকদের দিকে।

অনেক রকমের প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলো ওরা, টারজান আর জ্যাসন ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতেই এসেছে। আদর-অভ্যর্থনা করে তখন বসানো হলো দু'জনকে। অন্যদেরকেও চেয়ার দেয়া হলো।

কেবিনে আছে তখন পেলুসিডারের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা। আছে পেলুসিডারের সম্রাজ্ঞী সুন্দরী ডিয়ানের ভাই মহাবীর ডেকর, তুরীয়দের সর্দার গুর্কের ছেলে ক্যাপ্টেন কোল্ক, সারির রাজা। ঘক-এর ছেলে টানার! জানা গেল কোরসারে চলেছে বিশাল নৌ-বহর, কোরসারদের কারাগার থেকে ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে।

কথায় কথায় বলল টানার, 'এত কম লোক নিয়ে এসেছেন আপনারা কোরসারদের বিরুদ্ধে লড়তে? এ-তো অসম্ভব।'

'সব লোক এখানে নেই,' বলল টারজান। 'দল থেকে আলাদা হয়ে গেছি আমরা। ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ওখানেও লোক তেমন বেশি নেই। আসলে লোকবলের ওপর নির্ভর করছি না আমরা।'

'কিসের ওপর করছেন?'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছে টারজান, এই সময় ডেকে শোনা গেল চেঁচামেচি। হুড়মুড় করে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল সবাই। আকাশের এক দিকে হাত তুলে উত্তেজিত গলায় কি সব বলাবলি করছে নাবিকেরা।

টারজান আর জ্যাসনও মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল ওটা। ও-২২০, নিশ্চয় তাদেরকে খুঁজতেই বেরিয়েছে।

কামানের মুখ ঘোরানোর আদেশ দিল জা।

নিরস্ত করল টারজান। হেসে বলল, 'ওই বলের কথাই বলেছিলাম। ওটা টেরানোডন বা ওরকম কিছু নয়। আমাদের আকাশযান।'

অবাক হয়ে গেল পেলুসিডারের লোকেরা। হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে, দ্রুত এগিয়ে আসা আকাশযানের দিকে। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন ওরা। ওরা যে সময় এসেছে পৃথিবী থেকে, তখনও এ্যারোপ্লেন আবিষ্কার হয়নি।

এসে গেল ও-২২০। ঘুরে ঘুরে চক্কর দিতে লাগল মাথার ওপর।

এক যোদ্ধার হাত থেকে একটা বল্লম নিয়ে তাতে এক টুকরো সাদা কাপড় বাঁধল জ্যাসন। আকাশের দিকে তুলে সংকেত দিতে লাগল বিমানকে।

জাহাজের ওপর নামতে শুরু করল বিমান। সংকেত থামাল না জ্যাসন।

ডেকের পঞ্চাশ ফুট ওপরে নেমে এল ও-২২০। আর নামা সম্ভব নয়। পেলুসিডারের নাবিকদের কেউ কেউ গিয়ে লুকিয়েছে কেবিনে, ডেকে থাকার সাহস হয়নি। যারা আছে, তারা বোকা হয়ে গেছে যেন।

দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হলো বিমান থেকে। কোরসারদেরকে একে একে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিল টারজান। দ্বিধা করল ওরা। শেষে সাহস করে উঠে

যেতে লাগল একে একে। টোয়ার আর জেনাকেও তুলে দেয়া হলো সিঁড়িতে। উঠে গেল ওরাও।

টানারের দিকে ফিরল টারজান। বলল, 'আপনারা কোরসারের দিকে এগোন। আমাদের কাছ থেকে নির্দেশ না পেলে আক্রমণ করবেন না। আশা করি কোনরকম রক্তক্ষয় ছাড়াই উদ্ধার করে আনতে পারব সম্রাটকে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে জ্যাসন। টারজানও ধরল দড়ি।

কোরসারের দিকে চলতে শুরু করেছে ও-২২০। যারা নেমেছিল বিমান থেকে, একমাত্র ফন হোর্স্ট ছাড়া আর সবাই নিরাপদে ফিরেছে। তার জন্যে সকলের মন খারাপ। আগে সম্রাটকে মুক্ত করে আনবে, তারপর যাবে হোর্স্টকে খুঁজতে। যদি বেঁচে থাকে, খুঁজে বের করবেই।

কোরসারের উপকূল রেখা দেখা গেল। লাজোকে বলল টারজান, 'অনেক শক্তিশালী কামান আছে এই প্লেনে। ভয়ানক সব বোমা আছে। একটা ছুঁড়েই পুরো কোরসার ধ্বংস করে দেয়া যাবে। আমার কথা বিশ্বাস হয়?'

ও-২২০ দেখেছে লাজো। টারজান এখন যা বলবে তা-ই বিশ্বাস করবে। মাথা ঝাঁকাল সে।

'বেশ, তাহলে আমি যা বলব, করতে হবে তোমাকে। তাহলে বেঁচে যাবে কোরসার,' বলল টারজান।

দেখতে দেখতে শহরের ওপর চলে এল ও-২২০। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে রাজপথে, বাড়িঘরের ছাতে। হাঁ করে চেয়ে আছে সবাই আকাশের দিকে, বিমানটার দিকে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ উত্তেজিত।

শহরের তিন হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ও-২২০। লাজোকে বলল টারজান, 'তোমাকে এক কাজ করতে হবে। একটা সংবাদ নিয়ে যেতে হবে তোমাদের রাজার কাছে। তাহলে বাঁচবে পুরো কোরসার। যাবে তো?'

'যাব,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না লাজো।

'রাজাকে বলবে, আমরা এসেছি সম্রাট ডেভিড ইনেসকে মুক্ত করতে। পেলুসিডারের নৌ-বহর আসছে, সে কথাও বলবে। সম্রাটকে যেন জাহাজে তুলে দেয়া হয় নিরাপদে। নইলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব কোরসার। বুঝেছ?'

মাথা কাত করল লাজো।

'ঠিক আছে, তোমাকে নামানোর ব্যবস্থা করছি,' ডর্ফের দিকে ফিরল টারজান। 'একটা প্যারাস্যুট।'

প্যারাস্যুট নিয়ে এল ডর্ফ।

'কি এটা?' জিজ্ঞেস করল লাজো।

'প্যারাস্যুট,' ডর্ফের হাত থেকে বান্ডিলটা নিতে নিতে বলল টারজান।

'কি হয় এটা দিয়ে?' জানতে চাইল লাজো।

'দেখতে পাবে। নাও, এই দু'জায়গা দিয়ে হাত দুটো ঢোকাও। হ্যাঁ হয়েছে। কোরসারে হবে তুমিই প্রথম সম্মানিত লোক যে প্রথম আকাশ থেকে ঝাঁপ দেবে।'

'মানে?'

'বুঝতে পারবে এখুনি,' ঠেলে লাজোকে দরজার কাছে নিয়ে গেল টারজান। 'ঝাঁপ দেবে এখান থেকে।

'কি বলছ!' আঁতকে উঠল লাজো। 'ছাতু হয়ে যাব না!'

'কিচ্ছু হবে না। এটা তোমাকে নিরাপদে নামিয়ে নিয়ে যাবে,' প্যারাস্যুটে টোকা দিয়ে বলল টারজান। 'এখন মন দিয়ে শোনো, কি কি করতে হবে। খুব সহজ।' শূন্যে ঝাঁপ দেয়ার পর কি করে প্যারাস্যুট খুলতে হবে, বুঝিয়ে দিল টারজান।

'মরে যাব! মরে যাব!' ভয় যাচ্ছে না লাজোর।

'কিচ্ছু হবে না,' অভয় দিল টারজান। 'যেভাবে বলেছি, সেভাবে কাজ করলে কিচ্ছু হবে না তোমার।' বলতে বলতে এক ধাক্কায় লাজোকে বাইরে ঠেলে দিল সে।

ভয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কথামত কাজ করল লাজো। খুলে গেল প্যারাস্যুট।

নিরাপদেই নেমে গেল লাজো। ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে টারজান, একসঙ্গে অনেক লোক ঘিরে ধরেছে তাকে। হাত নেড়ে নেড়ে কি বলছে লাজো। শিগগিরই তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলো জনতার মিছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। পেলুসিডারের নৌ-বহরকে দেখা যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে কোরসারের দিকে। এই সময় বড়সড় একটা দল বেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদ থেকে। দু'জন লোককে সামনে নিয়ে মিছিল করে তারা এগিয়ে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে। আকাশ থেকে তাদেরকে অনুসরণ করল ও-২২০।

পেলুসিডারের নৌ-বহর এসে গেছে। সামনের জাহাজটার ওপর বিমান নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল টারজান।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে নেমে এল টারজান। তাকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠল অফিসার আর উচ্চপদস্থেরা। জাহাজ ঘাটে জাহাজ নিয়ে যেতে বলল তাদেরকে টারজান।

কোরসার বন্দরে থামল জাহাজ। কোরসারের রাজা স্বয়ং সম্রাট ডেভিড ইনেসকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠল, শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। আর কখনও যুদ্ধ করবে না, কথা দিয়ে নেমে গেল আবার জাহাজ থেকে।

স্যালুট করে সম্রাট ডেভিড ইনেসকে সম্মান জানানো হলো। তারপর সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে কেবিনে। দীর্ঘদিন বন্দী থেকে শুকিয়ে গেছেন সম্রাট। তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো আগে।

সম্রাটকে নিয়ে খুশি মনে দেশের দিকে ফিরে চলল নৌ-বহর।

ভালয় ভালয়ই মিটে গেল সব। এবার দেশে ফেরার পালা। ও-২২০-এর অভিযাত্রীদেরকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না সম্রাট ডেভিড ইনেস। আজ এ ছুতো কাল ও ছুতো করে কেবলই দেরি করিয়ে দিচ্ছেন।

শেষে আর ওদেরকে আটকে রাখতে পারলেন না সম্রাট। যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো টারজান।

'আমি এখন যাচ্ছি না,' বলল জ্যাসন।

'যাচ্ছো না!' অবাক হলো টারজান। 'কেন?'

'ফন হোর্স্টকে পাইনি এখনও, ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি। কিন্তু তুমি থেকে কি করবে?'

'তোমরা প্লেন নিয়ে চলে যাও। আমি হোর্স্টকে খুঁজে বের করে নিয়ে পরে যাব।'

'কি করে?'

'সম্রাটের কাছে শুনেছি, পৃথিবী থেকে সমুদ্র পথেই পেলুসিডারে আসা যায়, মেরুসাগর দিয়ে। এখানকার সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মেরুসাগরের। জাহাজ নিয়ে চলে যাওয়া যাবে। হোর্স্টকে খুঁজতে সাহায্য করবেন সম্রাট, কথা দিয়েছেন আমাকে।'

'তাহলে আমিও থেকেই যাই,' বলল টারজান।

'না, টারজান, ধন্যবাদ,' হেসে বলল জ্যাসন। 'তোমাকে ও-২২০-এর দায়িত্ব নিতে হবে। নিরাপদে ওটাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তুমি। দয়া করে এ কাজটুকু করতেই হবে তোমাকে।'

আর কিছু বলার থাকল না টারজানের।

'আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আগে টোয়ার আর জেনাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো জোরামে।'

'খবরদার!' পেছনে চেঁচিয়ে উঠল একটা মেয়ে কণ্ঠ। ঘরে এসে ঢুকেছে জেনা, তার পেছনে টোয়ার। 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে? আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছি না।' জ্যাসনের সামনে এসে দাঁড়াল জেনা। 'আরেকবার আমাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেই দেখো।'

মৃদু হাসল জ্যাসন। 'কারও ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করি না আমি। ঠিক আছে, থাকতে চাইলে থাকো।'

'আমিও যাচ্ছি না জোরামে,' বলল টোয়ার। 'হোর্স্টকে খুঁজতে আমার সাহায্য তোমার দরকার হবেই।'

'বেশ। আমার তাতেও কোন আপত্তি নেই।'

*

দ্রুত-সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠছে ও-২২০।

জানালার ধারে বসে আছে টারজান। দেখছে, নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পেলুসিডারের আদিম তৃণভূমি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সুযোগ পেলেই আবার আসবে এই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। জাহাজে করে। প্রাচীন

জলদস্যুরা যদি পালের জাহাজ নিয়ে আসতে পেরে থাকে, আধুনিক জাহাজ নিয়ে সে-ই বা পারবে না কেন?

ওয়াচ-কেবিনে টারজান যেখানে বসে আছে তার ঠিক নিচেই রান্নাঘরের জানালার কাছে বসে আছে রবার্ট জোনস। পকেট থেকে খরগোশের থাবা বের করে গালে বোলাল সে, বিড়বিড় করে কি বলল। তারপর ডায়েরী বের করে তাতে লিখল: দুপুর বেলা পেলুসিডার থেকে পৃথিবীতে রওনা দিলাম আমরা।